স্বর্গ-খেলনা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

অনির্বাণ প্রকাশনী ॥ ৯৩, গোবিন্দ বসু লেন ॥ কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
রুদ্রেন্দু সরকার
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

পরিবেশক :
বুকস এ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস
ডিসট্রিবিউটিং কোং
১৫, গণেশচন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা-১৩

সহযোগিতায় :
ইউ, বি, আই

মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

তৃতীয় সংস্করণ :
আশ্বিন ১৩৫৮

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

প্রকা

স্থ

ভ

৩

ক

পরিবে

বু

বি

১

ক

সহযো

ইং

মুদ্রক :

হা

সং

১,

ক

প্রচ্ছদ

গে

তৃতীয়

আ

১

মুরগির গলা ছিঁড়ছে? না তো, যেন একটা পানের বোঁটা ছেঁড়া হল। ভ্রূক্ষেপ নেই, অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছন্দ তার হাতের কাজ, একটু বিকৃতি নেই মুখের, যেন ছিটে-ফোঁটা ক্লেশ তার চোখে মুখে ফুটে উঠলেও হীরেন রাগ করত, কষ্ট হত, ধমক দিয়ে ছেলেটাকে সরিয়ে দিত। কিন্তু তা আর করতে হল না।

আজকাল যেমনটি সে চাইছে, হুলা তাই করছে। গলা আলগা করে ধড়টা বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে রাখল, মাথাটা কামরাঙ্গা গাছের দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর চোখ তুলে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে হুলা হি-হি করে হাসতে লাগল। যখন হাসে তখন তার চোখ ছোট হয়ে আসে, সামনের দিকের হলদে ছোপ ধরা উঁচু দাঁত দুটো চিবুকের কাছে নেমে আসে। কুচকুচে কালো গায়ের রং, মাথার চুলটা লাল, খাড়া খাড়া, শূয়রের লেজের যেমন শক্ত শলা শলা চুল, কিন্তু

তার হাসিটাই অদ্ভুত, সরলতার সঙ্গে একটা নিষ্ঠুরতা এসে মিশলে যা হয়।

সরলতাটা তার নিজের, তার ষোল বছর বয়সের অথবা তার প্রকৃতির, হাসির মতন তার জ্বলজ্বলে এবং দীঘির জলের মতন স্বচ্ছ চোখের মধ্যেও এই জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়। আগে, বছর দুই আগে খুবই পাওয়া গেছে, তখন তার সবটা হাসিই শিশুর মতন ছিল, হাসি তাকানো, নরম ঠাণ্ডা বোকা বোকা। তখন সে মাথায় এতটা লম্বা হয়ে ওঠেনি, চুলটা আর একটু নরম ছিল, খাড়া খাড়া অবশ্য সব সময়ই, কিন্তু এদিকে যেমন বেপরোয়া বেহিসাবী গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারার চুল হয়েছে, তখন সেটা ছিল না।

হুঁ মাথায় লম্বা হয়েছে, কাঁধ চওড়া হয়েছে, ছাতি ফুলে উঠছে, কোমর শক্ত হয়েছে। এক কথায় হুলাকে এখন বেটাছেলে বলা যায়। নির্বিঘ্নে খুন জখম করতে পারে, নারীসঙ্গ করতে পারে, জেলে যেতে পারে, শিক ভেঙে দেওয়াল টপকে জেল থেকে পালিয়ে আসতে পারে। অর্থাৎ সবরকম দুঃসাহস ও দুঃস্বপ্ন তার চওড়া ছাতির ভিতর বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে, কল্পনা করা যায়।

হীরেন তাই চাইছে। আর একটু নিষ্ঠুর হোক দুর্ধর্ষ হোক, স্বভাবের কোমলতা, ভিতরের সরল ভাবটা একবারে ধুয়ে মুছে যাক।

যাচ্ছে সন্দেহ নেই।

আগে ফাল্গুন পড়তে ওধারের মাদারের জঙ্গলটা যখন লাল হয়ে উঠত, হুলা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত, যেন রক্তরাঙা ফুলের গুচ্ছ ছেলেটাকে সম্মোহিত করত, কবি-টবি মানুষকে যেমন করে, প্রেমিককে যেমন করে, ঈশ্বর-অনুরাগী মানুষকে যেমন করে।

কেটে ফেল, কেটে ফেল, অত জঙ্গল ভাল লাগে না।

দু'বছরের প্রথম ফাল্গুনটা হীরেন অবশ্য চুপ করে ছিল। হুলা সেদিন চৌদ্দ বছরের কিশোর, সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোঁচড় ভর্তি করে

গাছতলা থেকে বাতাসে ঝরে পড়া মাদার ফুল কুড়িয়ে এনেছে। যেন নেশায় পেয়ে গিয়েছিল তার। সেই ফুল দিয়ে সে হীরেনের টেবিল সাজিয়েছে, বিছানা সাজিয়েছে, আলমারির তাকে কিছু—ড্রেসিং আয়নার ওপর কিছু কিছু ফুল রেখেছে।

চমৎকার লাগছে, ঘরের শোভা বেড়ে গেছে, কী বলেন?

হীরেন কিছু বলত না, চুপ করে ছেলেটার চকচকে চোখ দুটো দেখত।

তারপর অবশ্য ফাল্গুন শেষ হল। মাদার ফুল মজে গেল। গাছের ডালে তখন শুকনো খড়কের মতন কালো কালো শিম ছাড়া আর কিছুই নেই, মাদার ফল, মাদারের বীচি? যাই হোক, হীরেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ক'দিন ধরে কেবল লাল ছটা দেখে দেখে তার অরুচি ধরে গিয়েছিল।

এই জীবনে এমন অনেক ভাল জিনিস, সুন্দর কিছু দেখেছে সে, দেখে এমনি অরুচি ধরেছে। অথচ অন্য অনেকের চোখে যা রীতিমত মোহ চমক বিস্ময় ইত্যাদি সৃষ্টি করত, কেউ কেউ স্বর্গীয়-টর্গীয় বলতেও দ্বিধা করত না, দেখে হীরেন মনে মনে হাসত, তা বলে কারো সঙ্গে এই নিয়ে সে ঝগড়া করত না, তর্ক করত না স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দিক থেকে নিজের চোখ দুটো সরিয়ে নিত, অথবা চোখ বুজে থাকত।

চোখের ভিতরের অন্ধকার অনেক শান্তি দিত।

লাল ব্লাউজ, লাল শাড়ির মতন এখানে মাদার বনের রক্তিম উল্লাস। বসন্তের মুখেই সে এখানে চলে এসেছিল কি না।

তাহলেও প্রথম বছর কিছু বলেনি, লাল ফুল নিয়ে অনেক আনন্দই করল হুলা। যেন নতুন এসেই ছেলেটাকে বাধা দিতে, নিষেধ করতে হীরেনের বাধছিল।

কিন্তু গত ফাল্গুনে সে আর ইতস্তত করেনি। নিজের ব্যবহারে সে হেসেছিলও খুব। আশ্বিন মাসে বলতে পারত সে, পৌষ মাসে

হুলাকে গাছ কাটার কথা বলতে ক্ষতি ছিল কী।

না, তখনও মাদারের কলি আসেনি ফুল ফোটেনি, যেন চোরের মতন হীরেন অপেক্ষা করছিল—কথাটা ঠিক হল না, শয়তানের মতন একটা প্রগাঢ় আক্রোশ ও উল্লাস বুকে পুষে রেখে সে দিন গুণছিল, তারপর পট পট করে কলিগুলি যখন চোখ খুলল, দেখতে দেখতে ক'দিনের মধ্যে জঙ্গল রক্তিম সজ্জা নিয়ে মোহিনী হয়ে উঠল, হীরেন ঘর থেকে কুড়ুল টেনে বার করল, কাটারি বার করল।

আয়, অস্ত্রপাতি হাতে নিয়ে সে হুলাকে ডাকল, যেন হুলাও তখন মাদার বনে ছুটে গিয়ে ফুল কুড়াবার জন্মে মনে মনে তৈরী হচ্ছিল। বাবুর হাতে কুড়ুল কাটারি দেখে তার চোখ বড় হয়ে গেল। কি ব্যাপার?

ওই মাদার গাছ রাখব না, সব কেটে সাফ করব। হীরেন হাসছিল।

মুখটা ছোট হয়ে গিয়েছিল হুলার। ঢোক গিলছিল।

বুঝলি না? হীরেন তাকে বুঝিয়েছিল, ফুলের বাহার আর ক'দিন, দু'দিনই রংচং ঝিলিমিলি, তারপর আবার যে-কে-সেই, কাঁটার জঙ্গল, বরং ওখানটায় আমরা বেগুন গাছ লাগাব, ডাঁটা শাক করব, এতটা জমি এমনি ফেলে রাখা যায় না।

হুলা নীরব। গাছের ফুল দেখছিল না আর, হীরেনের হাতের চকচকে কাটারি, ধারালো কুড়ুল দেখছিল। হীরেন তার হাতে একটা অস্ত্র তুলে দিয়েছিল।

চোখের জেল্লাটা কিছু না, কোন্‌টা আমাদের দরকার সেটা আগে দেখতে হবে। হীরেন হুলাকে বুঝিয়ে চলল, বেশ ভাল করে মাটি কুপিয়ে একধারে বেগুন চারা লাগাব, ওপাশটায় ডাঁটার বীজ ছড়িয়ে দেব, বেড়া দিয়ে কিছু ঝিঙে উচ্ছে লতিয়ে দিলেও ঢের কাজ হবে, খাওয়া ও পয়সা—দু'দিক থেকেই লাভ।

কথাটা হুলা বুঝেছিল, ভাল করে বললে কেন বুঝবে না, কাদার মতো নরম মন, পছন্দ মতন ছাপ ফেলতে পারলে সেই ছাপটাই থেকে যাবে।

ছাপ ভাল করেই পড়েছে কিশোরের মনে। হীরেন যেমন চেয়েছে। আজ কি আর কিশোর রয়েছে উল্লাসীর ছেলে!

গত ফাল্গুনে পনেরো ছিল বয়েস, আজ হুলা ষোলয় পা দিয়েছে, ছাতি ছড়িয়ে পড়েছে, কাঁধ উঁচু হয়েছে, নাকের নীচে চমৎকার গোঁফের রেখা।

আর চোখ, দীঘির কালো জলের মতন ঠাণ্ডা ঝলক একটু আধটু থেকে গেলেও, যখন উত্তেজিত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, হুলার চোখের মণি কঠিন হয়ে ওঠে, যেন অল্পস্বল্প আগুনের স্ফুলিঙ্গও ঠিকরে বেরোতে চায়। যুবক হচ্ছে হুলা, হাতের শিরা কপালের রগ এখনই সময় সময় বেশ ফুলে উঠছে।

গত বছরই বোঝা গিয়েছিল। হীরেন গাছ কাটতে আরম্ভ করেছিল, দেখাদেখি হুলাও কাজে হাত লাগিয়েছিল। আশ্চর্য, গাছ কাটতে আরম্ভ করে কিন্তু হুলা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। বসন্তের লাল ফুলের আবেশ ভাব চোখ থেকে উধাও হয়েছিল, ফুল কুড়াবার নেশার জায়গায় গাছ কাটার নেশায় তাকে পেয়ে বসেছিল।

কাট, সব কেটে ফেল। হীরেন কাছে দাঁড়িয়ে হুলাকে নিষ্ঠুরতার, ক্রূরতার ইনজেকশন দিয়ে চলেছিল।

কুড়ুলের আঘাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল নিয়ে এক একটা গাছ থর থর করে কাঁপছিল, তারপর এক সময় মড়মড় শব্দ করে ডালপালা সমেত মাটিতে কাত হয়ে পড়েছিল, হুলা তখন হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

হবে, এই ছোঁড়াকে দিয়ে হবে। হীরেন বুঝতে পেরেছিল। একটা সুন্দর কিছু নষ্ট করতে ধ্বংস করতে যে আনন্দ পায় তার

কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করা যেতে পারে সন্দেহ কি, হীরেন আশ্বস্ত হয়েছিল।

গাছ কেটে শেষ করে ঘেমে-টেমে হুলা যখন তার কাছে এসে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল, হীরেন তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল। সাবাস! একটা কাজের মতন কাজ হল। মাদার গাছ দিয়ে কিছু হয় না। কেবল সাপের আড্ডা। এবার ডালগুলো কেটে আমাদের আনাজ ক্ষেতের চমৎকার বেড়া হবে। ঝিঙে বেগুন ডাঁটাশাক পটল কুমড়ো—শীতকালে ফুলকপি ওলকপি টমেটো আলু যা খুশি আমরা করতে পারব।

শুনে হুলা খুশি হয়েছিল।

চোখের আনন্দের চেয়ে পেট ভরার আনন্দটা যে আগে দরকার, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হীরেন তাকে বোঝাচ্ছিল। হাটবাজার দূরে, কাঁচা লঙ্কাটার জন্যও আমাদের তিন মাইল হাঁটতে হয় দরকার কি, কতটা জায়গা আমরা এখন পেয়ে গেলাম, এটা ওটা ফলাতে পারব।

অবশ্য আজ পর্যন্ত কিছুই ফলানো হয়নি। বসন্তের পর গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে—শরৎ হেমন্ত শীত, দেখতে দেখতে আবার ফাল্গুন এসে গেল, জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে, ঠিক ফাঁকা নয়, বর্ষার শুরুতে কাঁটা জঙ্গল গজাতে আরম্ভ করেছিল, এখন অনেক দূর সেটা ছড়িয়ে পড়েছে। দমকা বাতাস দিলে কাঁটা ঝোপ থরথর করে কাঁপে।

কিন্তু আনাজ ফলানো হয়নি বলে হুলারও যেন আফসোস নেই। হু-হু করে হাওয়া আসে। মাদার জঙ্গল হাওয়া আটকাত। এখন সরাসরি ওদিকের মেঠো বাতাস এসে গায়ে লাগে, এটাই যথেষ্ট।

কি বলিস হুলা?

তাই তো। হুলা মাথা নেড়েছিল। দিন কয়েক আগের ঘটনা। এ বছর ফুলের মুখ দেখল না বলে হুলার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ

নেই টের পেয়ে হীরেনের ভাল লাগছিল। অথচ উল্লাসী, হুলার মা সেদিন খুব হা-হুতাশ করছিল, জায়গাটা কেমন ন্যাংটা হয়ে গেছে, দেখতে ভাল লাগে না।

খুব ভাল লাগে, আমার ভাল লাগে, হুলার ভাল লাগে। হীরেন ধমকের সুরে বলেছিল, মাদার জঙ্গলে আকাশটা ঢাকা পড়ে থাকত, বাতাস আটকা পড়ত—এখন সবটাই ফাঁকা, খোলা মেলা।

ইচ্ছে করেই ওখানটায় হীরেন যেন ঝিঙে পটল আলু কিছুই লাগাল না। থাক, এমনি পড়ে থাক, কাঁটা ঝোপে ঢেকে থাক জমি। যেন এটা তার আর একটা নতুন জেদ। অথবা পক্ষান্তরে হুলাকে যেন বোঝাতে চাইছে, আনাজ ক্ষেত করা হল না বটে, আপনা থেকে কাঁটাবন গজিয়েছে, আমাদের তাই দেখতে ভাল লাগছে, ফুলের চেয়ে ঝিঙে বেগুন ভাল, তার চেয়েও কাঁটা আমরা বেশি পছন্দ করি।

কি বলিস হুলা?

হুলা ঘাড় নাড়ে। এবং তার ঠিক দু'দিন পরেই দেখা যায় ঘর থেকে কাটারিটা টেনে নিয়ে হুলা বাড়ির পশ্চিম সীমানায় ছুটে যাচ্ছে। প্রথমটা হীরেন বুঝতে পারেনি, উল্লাসী তখন উঠোনের একদিকে বসে খড়ের আঁটি বাধছিল, হঠাৎ চোখ তুলে ছেলের কাণ্ড দেখছিল, হুলা ততক্ষণে অতসী বনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি করবি, কি হচ্ছে ওখানে?

খড়ের আঁটি ফেলে রেখে উল্লাসী চিৎকার করে সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করল। যেন তখনি একটা কিছু আঁচ করতে পেরেছিল সে। হীরেন কথা বলছিল না। বারান্দার খুঁটি ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন রকম চঞ্চলতা বা উদ্বেগের চিহ্ন তার মুখে ছিল না। যেন ততক্ষণে সেও বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা, তাই বড় বেশি নির্বিকার ও নিশ্চল থাকতে পেরেছিল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাকেও অতসী ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। উল্লাসী পাগল হয়ে উঠেছে। ছু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে ধরতে যাচ্ছে। ছুলা ধরা দিচ্ছে না। হি-হি করে হাসছে। আহা। অমন সুন্দর ফুলের গাছ কাটিস না, কাটিস না। চেঁচামেচি করে কিছুই হচ্ছিল না, ছু'বার ছেলের হাত ধরতে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সরে এসেছে। শেষটায় যেন নিরুপায় হয়ে উল্লাসী প্রায় কাঁদতে আরম্ভ করেছিল, অনুনয় করে বলছিল, আমার ঠাকুরের পায়ে রোজ ফুল দিতে হয়—তুই জানিস, সব গাছ কেটে দিলে আমি ফুল পাব কোথা—

ধেৎ! ঠাকুরের ফুল! ছুলার হাতের কাটারি রৌদ্রের ঝলক লেগে নেচে উঠছিল। ঘচঘচ কোপ মেরে অতসী জঙ্গল পরিষ্কার করে দিচ্ছে সে। আর ফাঁক বুঝে এদিকে মুখটা বাড়িয়ে ভেংচি কেটে মাকে বোঝাচ্ছে, তোর হাতের ফুল না পেলেও ঠাকুরের দিন যাবে।

শুনে হীরেনের খুব হাসি পাচ্ছিল, হাসেনি, যদিও ঠোঁট ছুটো চেপে ধরে তেমনি চুপ করে ছিল।

উল্লাসীর চোখে সত্যি জল এসে গিয়েছিল।

মেঠাই না মণ্ডা না, কেবল ছুটো ফুল খেয়ে ঠাকুর তোর ইষ্ট করবে কি না—তবেই হয়েছে, হি-হি-হি-হি! ছুলা নতুন করে মাকে কথাটা শুনিয়ে কাটারি বাগিয়ে গাছ কাটায় মন দিয়েছে।

শুনেছেন, দস্যুর কথা শুনছেন কর্তা—হীরেনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে উল্লাসী কাকুতি জানাচ্ছিল। আপনি একবার বারণ করুন, হারামজাদা আমার সব ক'টা ফুল গাছ কেটে শেষ করল।

উল্লাসী নিজের হাতে উঠোনের পশ্চিম দিক ঘেঁষে অতসী বাগান করেছিল। রোজ স্নান করে ঠাকুরকে তার ফুল দেওয়া চাই। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির একটা ফটো আছে উল্লাসীর ঘরে। এই তার ঠাকুর। মাঘের মাঝামাঝি থেকে ফুল ফুটতে শুরু করে ফাল্গুনের শেষ

পর্যন্ত অতসীর হলুদ আভায় জায়গাটা ঝলমল করতে থাকে।

দু'বছর আগে এখানে এসেই হীরেন লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু গত ফাল্গুনেও সে চুপ করে ছিল। তাছাড়া, হুলাকে নিয়ে গত বছর সে বাড়ির পূবদিকের মাদার জঙ্গল পরিষ্কার করেছে। অতসীবনের দিকে ততটা মনোযোগ দেয়নি, মাদারের টকটকে লাল ফুলই তার চোখে বেশি অসহ্য ঠেকছিল। যেন অতসীর হলুদ ছটা ততটা অস্বস্তিকর ঠেকেনি। কিন্তু এবার দেখা গেল হুলাই আগে এগিয়ে এসেছে অতসী বন সাফ করতে। বোঝা গেল হুলার চোখে অতসী ফুলও অসহ্য হয়ে উঠেছে। এক বছরেই ছোড়া তার ট্রেনিং পেয়ে কেমন কঠিন মানুষ হয়ে উঠল ভেবে হীরেন ভিতরে ভিতরে খুবই তৃপ্তি পাচ্ছিল।

অতসী জঙ্গল পরিষ্কার করার পরে ওখানটায়ও যে শিম বেগুন উচ্ছে ঝিঙে লাগানো হবে না, হীরেন যেমন জানে, হুলাও তা ভাল করে বুঝে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি বৃষ্টির ফোটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পুব সীমানার মতন পশ্চিম সীমানায়ও কাঁটা গজাতে আরম্ভ করবে। তারপর দেখতে দেখতে সবটা জায়গা কাঁটা বনে ছেয়ে যাবে। আগামী ফাল্গুন চৈত্রে দমকা হওয়া লেগে কাঁটা জঙ্গল থরথর করে কাঁপবে। হীরেনের মতন হুলারও তখন সেই দৃশ্য দেখে আহ্লাদে সীমা পরিসীমা থাকবে না। চল্লিশ বছরের ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া হীরেনের মতন ষোল বছর বয়সেই হুলার মন ফুল ছেড়ে কাঁটার দিকে ঝুঁকেছে, এ কম কথা কী।

কিন্তু উল্লাসীর কান্নাকাটি থামছিল না।

ঠিক আছে আমি হাট থেকে মাটির টব কিনে এনে দেব—টবের মধ্যে ফুলগাছ আরো চমৎকার হয়, অনেক ফুল ফুটবে। হীরেন বুঝিয়েছিল, কিন্তু উল্লাসী তার অতসীবনের শোক কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

উহু, অমন সুন্দর হলুদ ফুল মাটির ভাঁড়ে ফুটবে না, ফুটবে না গো কর্তা, ছেলে আমার কী সব্বনাশ করল। মাথার চুল ছেঁড়ার উপক্রম করছিল উল্লাসী।

ফুটবে, কেন ফুটবে না, ভাল মাটি পেলে সার পেলে নিয়মমতো জল পড়লে টবের ফুলই সুন্দর হয়, বড় হয়। হীরেনকে বলতে হয়েছিল, অতসী ফুল কি একটা ফুল, ক্ষুদে ক্ষুদে হলদে, অবিকল যেন অড়হর ফুল। তেমনি অড়হব গাছের মতন লম্বা গাছ, জঙ্গলে গাছ, সাপখোপের আড্ডা। খুব ভাল করেছে হুলা সাপ বিদেয় করে।

সত্যি হুলা এতক্ষণে এতবড় অতসীবন সাবাড় করে কাটারিটা হাতে ঝুলিয়ে বাহাদুব ছেলের মতন দু'জনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দস্যুর মুখের দিকে তাকাতে উল্লাসীর বুঝি ঘেন্না হচ্ছিল। জলে ভেজা চোখ দুটো তুলে হীরেনকে দেখছিল। কিন্তু হীরেনকেই কি মনে মনে সে ক্ষমা করতে পারছিল। যেন তার বুঝতে বাকি ছিল না --এই যে ডাকাতের মতন কাটারি হাতে ছুটে গিয়ে, বলতে গেলে এক নিশ্বাসে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে এত ফুলগাছ কেটে হুলা শেষ করল, পিছনে কর্তাবাবুর উস্কানি আছে।

তা না হয় উস্কানি আছে, যেমন আগের বছর হুলাকে নিয়ে মাদার জঙ্গলটা কেটে শেষ করে দেওয়া হল। হুলাই বেশির ভাগ গাছ কেটেছিল। কিন্তু কেন, ফুলেব ওপর কর্তাবাবুব এই অরুচি বিদ্বেষ কেন। সুন্দর বলে? সুন্দর দেখলে বাবুর মাথা গরম হয়।

যেন কথাটা ভাবতে গিয়ে উল্লাসী বেশ একটু থতিয়ে পড়েছিল। চোখ বড় করে টলটল করে বাবুর মুখটা দেখছিল, শরীর দেখছিল। বযস হয়েছে। হীরেনের কপালে একটা দুটো রেখাও হয়তো আবিষ্কার করেছিল সে। এবং এভাবে তাকিয়ে থেকে কর্তাবাবুর বয়সটাও নিশ্চয়ই কতকটা অনুমান করতে পেরেছিল উল্লাসী।

যেন এই পর্যন্ত এসে তারপর উল্লাসীর ভাবনা নতুন খাতে বইতে

সুরু করেছিল।

আশ্চর্য কিছু না, হয়তো সুন্দর জিনিস ধরতে গিয়ে, পেতে গিয়ে বাবু কবে একদিন ঠেক খেয়েছিল, ঠোক্কর খেয়েছিল, তারপর থেকে আর সুন্দর কিছু সহ্য হচ্ছে না, দেখলেই মাথা গরম, কুড়ুল দিয়ে কাটারি দিয়ে কেটে না ফেলা পর্যন্ত চোখে ঘুম আসে না, খাওয়া হজম হয় না। তাই কি ?

যেন তারপর ড্যাবডেবে কালো চোখ দুটো বাগিয়ে ধরে উল্লাসী ভাবছিল, বাবুর কি আর কেউ নেই, কথাটা কোনদিন সে জিজ্ঞেস করেনি, জানতেও চায়নি। বছর দুই হুট করে কোথা থেকে এখানে ছুটে আসে হীরেন নামে এই ভদ্দরলোকটি। ভদ্দরলোক তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর চালচলন কথাবার্তা খাওয়াপরার ধরনধারণ দেখে নিতে উল্লাসীর মোটেই বেগ পেতে হয়নি।

হুঁ এখানে এসেই বাবু জমিটমি কিনল, বাগান কিনল। ঘোষ বাবুদের একটা দীঘি কিনে ফেলল, তারপর ঘোষ বাবুদেরই এই পোড়ো ভিটিটা কিনে চমৎকার ঘর তুলল।

গরু ছাগল হাঁস পায়রা মুরগি সবই করা হয়েছে। যেন পাকাপোক্ত এক গেরস্থের সংসার। বাবু নিজের হাতে অবশ্য কিছুই করে না। কেন করবে, পয়সাওলা মানুষ, উল্লাসীকে কি একথা বলে দিতে হবে, জন খাটিয়ে বাবু চাষ-বাস করাচ্ছে, তারাই বাবুর পুকুর দেখে, বাগান দেখে, হাঁস মুরগি ছাগল গরুর তদারক করে।

এদিকে ঘরের কাজ—জল তোলা বাসন মাজা রান্নাবান্না ঝাড়পোছ, সবই করতে হয় উল্লাসীর। যেন এবাড়ির ঝি বলতে সে, রাঁধুনী বলতে সে, গিন্নী বলতেও উল্লাসীই। অবশ্য টাকাপয়সা তার হাতে থাকে না, তাহলেও জমি থেকে কত ধান উঠে এল, কি পরিমাণ আলু এল, ডাল এল, সেসব শুকিয়ে ঝাড়াই মাড়াই করে গোলায় তোলা তারপর দরকার বুঝে খরচ করা—সবই উল্লাসী।

জেলেরা পুকুরে জাল ফেলে কী মাছ ধরল, বাবুর জন্যে ক'টা মাছ এল, বাগানে এবার আম জাম লিচুর ফলন কেমন হয়েছে, ঘুরে ফিরে উল্লাসীকে খোঁজ রাখতে হয়। চাকর বাকরের ওপর ওসব ভার ফেলে রাখলে হয়েছিল আর কি।

বাবু অবশ্য হুলার মাকে এত সব করতে বলে না, বাবু কিছুই বলে না, যেন জমি কিনবার কিনেছে, পুকুর বাগান কিনবার কিনে রেখেছে তারপর কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে, চোখ তুলে তাকাতেও আলসেমী।

এই এক ধরনের মানুষ—ক'দিন আগে উল্লাসী শুনেছিল, এক সঙ্গে অনেক হাঁস মুরগি পুষে বাবু ডিমের ব্যবসা করবে, তোড়জোড় করে খাঁচাটাচা তৈরি করা হল, হাঁস মুরগিও কম কেনা হল না—তারপর চুপচাপ। ক'টা হাঁস বেঁচে আছে, ক'টা বা মরল, মুরগি ডিম দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, চোরে ক'টা নিয়ে গেল. শেয়ালের পেটে কিছু গেল কি না—কিছুই জানতে দেখতে বাবুর উৎসাহ নেই। যতটা পারে উল্লাসীই দেখাশোনা করে খোঁজখবর রাখে, তা না হলে পুকুরের মাছ বা বাগানের ফল থেকে আরম্ভ করে হাঁস মুরগি—পাঁচভূতে সব লুটেপুটে খেত। চাকরদের যোগসাজসেই এসব হত।

যাই হোক, রান্নাবান্না ঝাড়-পোছ ছাড়াও এবাড়ির আরও অনেক কাজ উল্লাসীকে করতে হয়, অনেক কিছুর ওপর চোখ রাখতে হয়।

হুলার কিছু বয়স কম হয়নি. পনেরো ষোল বছরের যোয়ান ছেলে, মাকে এটা ওটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু করবে না, বাবুর জন্যেই করছে না, যেন বাবু চাইছে না এসব ঘরগেরস্তালীর ব্যাপারে হুলা নাক ঢোকাক।

বাবুর ইচ্ছা, হুলা সব সময় তাঁর কাছে থাকুক। গল্পগুজব করুক, একসঙ্গে দু'জনে বেড়াক, বনবাদাড়ে ঘুরে রং-বেরঙের পাখি দেখুক।

আকাশে পায়রা উড়িয়ে দিয়ে দু'জনে পায়রার খেলা দেখে, তা না হয় দেখল, কিন্তু সময় সময় এমন সব খেলায় মেতে ওঠে দু'জনে,

যদি একটা পায়রা ভাল উড়তে না পারল তো সেটাকে ধরে মাটিতে আছাড় দিয়ে হয়তো মেরেই ফেলল নয়তো দুটো পাখাই কেটে দিল। বাবুকে কিছু বলতে পারে না, সাহস পায় না, আড়ালে ডেকে হুলাকে ক'দিনই গালমন্দ করেছে উল্লাসী, গালমন্দ শুনে খেলা বন্ধ করতে হুলার বয়ে গেছে, উল্টে মাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যা-তা কথা শুনিয়ে দিয়ে তখনি আবার বাবুর কাছে ছুটে গেছে।

দুটো ষাঁড়ের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়ে দু'জনে মজা দেখে, একটা আর একটার শিং ভেঙে দেয়, বা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে একটা ষাঁড় আর একটা ষাঁড়ের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরায়। এই রক্তঝরা লড়াই দেখে দু'জনের আহ্লাদ ধরে না। বাবু হাততালি দেয়, হি-হি করে হাসে। দেখাদেখি হুলাও হাততালি দেয়, হি-হি করে হাসে।

তাই, উল্লাসী চিন্তা করে, একটা কিছু হয়েছে ভদ্দরলোকটির, বুকের ভিতর রক্ত ঝরছে, মনটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে, এতটা যার বয়স হল, দুম্ করে শহর ছেড়ে এই বনবাদাড়ে এসে একলা ঘর বেঁধে নিজের মতন করে থাকছে, পেছনে একটা রহস্য না থাকলে এমন হয়? ফুল গাছ কেটে আনন্দ, পায়রার পাখা কেটে দিয়ে আনন্দ, দুটো ষাঁড় গুঁতোগুঁতি করে মরছে দেখে আনন্দ —

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে জগৎ সংসারের আলো আঁধারের রকমফের উল্লাসী কি আর নিজেও কিছু বোঝে না, বেশ বোঝে, একটা কিছু হয়েছে বাবুটির—

তা হোক, এই নিয়ে উল্লাসীর বলার কিছু নেই, হয়তো ভাববারও কিছু ছিল না, কিন্তু তার এই দুধের ছেলেটাকে বাবু টেনে টেনে নিচ্ছে কেন, যেন নিজের খেয়াল খুশি মতন ছোঁড়াকে গড়ে পিটে তুলতে বাবুর উৎসাহ। কারণ কি? দু'বছর আগেও তো উল্লাসী ছেলেকে দেখেছে, পেটের সন্তান, তার মন কি চাইত, কি করলে হুলা খুশি হত, উল্লাসীর চেয়ে কে আর তা বেশি

জানবে বা জানত। একটা পাখিকে ধরে বুকের কাছে নিয়ে আদর করতে পারলে ছেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে, কিছু ফুল কুড়িয়ে আনতে পারলে যেন রাজ্য-জয় করে ফিরত আর সেই ছেলে কি না একটার জায়গায় ছুটো পায়রাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলতে পারলে ধেই ধেই করে নাচে, ফুলের বাগান কে বাগান কুড়ুল-কাটারি দিয়ে কুপিয়ে শেষ করে দিয়ে শান্তি পায়।

হীরেন সবই বোঝে, উল্লাসীর চোখ দেখে তার মনের কথা টের পায়। একটা কঠিন কিছু দেখলে মেয়েটা ভয় পায়, আঁতকে ওঠে, কোনরকম নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারে না। যেন এখনও, এই বয়সেও ভেতরটা কাদার মতো নরম, ফুল ভালবাসে, পাখি ভালবাসে। ফুলের মন নিয়ে, পাখির সরলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, সব মানুষই যেমন আসে, তারপর একদিন কিছু কিছু মানুষ বদলে যায়, কেন বদলে যায়, কে কোন্ দিক থেকে ধাক্কা খায় বলা মুশকিল, তবে বদলে যায়, হীরেন বদলে গেছে, কিন্তু হুলার ম' অবিকল শিশুটি থেকে গেছে।

ভাবতে গেলে অবাক লাগবারই কথা। এটা এক দিকের ভাবনা।

আর এক দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয়, এটাই স্বাভাবিক, সব মানুষই এভাবে বেঁচে থাকে অন্তত বেঁচে থাকা উচিত, শৈশব থেকে আরম্ভ করে বুড়ো হওয়া পর্যন্ত, বুড়ো হয়ে চিতায় ওঠার দিন পর্যন্ত। একটু বদলাবে না, এতটুকু পরিবর্তন হবে না মনের স্বভাবের, তার চাওয়া না-চাওয়া ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাল-লাগা মন্দ-লাগা চিরদিন এরকম থেকে যাবে, চন্দ্র-সূর্য যে নিয়মে আকাশে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, বসন্ত যে ভাবে আসে বিদায় নেয়, বর্ষা যেমন আসে আবার চলে যায়, কোটি বছরেও এদের রূপের পরিবর্তন হল না।

অভাব অনটন শোক দুঃখ? সেসব কিছু না, যেন এগুলো বাইরের ব্যাপার, ওপরের জিনিস, যেমন শীত পড়লে মানুষ গায়ে চাদর জড়িয়ে

নেয়, গরম লাগলে চাদর খুলে ফেলে—মানুষটা ঠিকই থাকে, একরকম থাকে। হুলার মাকে দিয়েই এটা বোঝা যায়।

হীরেন যা শুনেছে। হুলা ছোট থাকতে তার বাপ মরে যায়। লোকের বাড়িতে জন খাটত, দিন আনা দিন খাওয়া—এই অবস্থায় পুরুষটা চোখ বুজতে হুট করে উল্লাসীকে একদিন কেমন বিপাকে পড়তে হল। একটা না দুটো মুখ। তার ওপর অসুখবিসুখ আছে, এক বাড়িতে কাজ জুটল তো আর এক বাড়ির কাজ চলে গেল, কি একসঙ্গে দু'বাড়ির কাজ বন্ধ—কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হল না, আধপেটা থেকেছে উপোসে কেটেছে, নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়েছে—এভাবে হুলাকে তো বড় করে তুলল, কুড়ি বছরের বিধবা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশে পা দিয়ে উল্লাসী নিজেও তো বেঁচে আছে।

অথচ আজও তার সেই মন, শিশুকালের কোমলতা, সেই ফুল পাখি, সকালের শিশির দেখে আহ্লাদে দিশেহারা হওয়া, সন্ধ্যার রক্তছটা দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা—অর্থাৎ ঝড়ঝাপটা সবই ওপর দিয়ে গেছে, মনকে ছুঁতে পারেনি, নষ্ট করতে পারেনি।

দেখে হীরেনের ভাল লাগে। কাজেই একদিকে উল্লাসীকে দেখে অবাক হয় সে, আবার অবাক হয়ও না। এই তো স্বাভাবিক, ভাবে সে।

২

আর একটা জিনিস।

চিন্তাটাকে হীরেন অবশ্য প্রশ্রয় দিতে চায় না, তা হলেও যেন আপনা থেকে চোখটা গিয়ে সেদিকে পড়ে। উল্লাসীর রূপ। তার যৌবন। যেন হঠাৎ ভুলে যেতে হয়, ষোল বছরের হুলা তার ছেলে। আশ্চর্য গড়ন শরীরের। যেন কোনদিন যৌবনকে যেতে দেবে না এমন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এতটা বয়সে এসে সে পৌঁছাল। হোক কালো রং। কিন্তু কী চমৎকার সেই কালো। পরিপুষ্ট রসালো পাকা কালো জামের কথা মনে করিয়ে দেয়। তেমনি চকচকে ঝকঝকে মসৃণ টনকো চামড়া। উনিশ বছরের মেয়ের গায়ের চামড়া এমন থাকে। সেরকম শক্ত সমর্থ কোমর, বুক। চুলের চাকচিক্য, চুলের গোছা, চোখের ধার দীপ্তি। সব ঠিক আছে, কিছুই নষ্ট হয়নি। যেমন মনটাকে রেখেছে,

শরীরটাকেও উল্লাসী তাজা রেখেছে, সুন্দর রেখেছে, এতটুকু বিকার আসতে দেয়নি ময়লা জমতে দেয়নি।

ময়লা জমবার খুবই সম্ভাবনা ছিল, সুযোগ ছিল। অনাথা বিধবা, এই দুয়ারে সেই দুয়ারে গিয়ে খেটে খেতে হয়েছে। অথচ গা ভরা যৌবন।

কিন্তু তা হলে হবে কি, সব যুবতীই এক নিয়মে চলে না। রূপ থাকলেই তাতে গাদা গাদা বারুদের মিশেল থাকবে, আগুনের আঁচ লাগতে না লাগতে ফস্ করে জ্বলে উঠবে, উল্লাসী তার ব্যতিক্রম।

দু'বছর একটি মেয়েকে দেখে চিনতে বুঝতে কষ্ট হয় না। কী সাংঘাতিক নিষ্ঠা নিয়ে উল্লাসী তার বৈধব্যজীবন পালন করছে, শুচিতা রক্ষা করছে, হীরেন চোখের ওপর দেখেছে।

একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যা তো আছেই, তা ছাড়া এই তিথির স্নান, অমুক তিথির পূজা, অমুক তিথির উপোস—কিছুই সে বাদ দেয় না। মেনে চলা চাই।

হীরেন প্রথম মেয়েটিকে দেখে ভয় পেয়েছিল। কেননা অনেক অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষী সে নিজে, অনেক ময়লা চোখের ওপর দেখেছে, কখনও হাত দিয়ে সে সব ময়লা তাকে ঘাঁটতেও হয়েছে।

ময়লা, জঞ্জাল আর চোখে দেখতে না হয়, দুর্গন্ধ এসে নাকে না লাগে, এইজন্য তার এখানে ছুটে আসা।

অবারিত নীল আকাশ, স্বচ্ছ রৌদ্র, নিবিড় কালো রাত্রি, আগুনের স্ফুলিঙ্গর মতন কোটি কোটি নক্ষত্র, মাঠ বন—সবই তার ভাল লেগেছিল।

নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিল সে, নির্জন প্রকৃতি হাত বাড়িয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এটি কে?

কোন্ এক তারাপদ ঘোষেব জমি কিনে হীরেন ঘর বাড়ি

তুলবে, গাছ গাছালিতে ঠাসা দশ কাঠা মাটির সবুজ মনোহর চেহারা দেখে সে ভারি মুগ্ধ।

জমির কোণার দিকে কামরাঙা গাছের নিচে পাতার ছাউনি দেওয়া ডেরা দেখে সে ভেবেছিল, এমনি পড়ে আছে, হয়তো কোন ভিখিরি, কোন বাস্তুহারা দু'দিনের জন্য এসে এখানে মাথা গুঁজেছিল, এখন খালি পড়ে আছে।

ডেরার সামনে গাছের ছায়ায় একটা কুকুর। এক চোখ বুজে আর একটা চোখ খুলে ঘাসের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। হীরেনকে দেখেই মাথা তুলল, বোজা চোখটা চট করে খুলে ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়ায়, লেজের ধুলো ঝেড়ে ভীষণ হৈ-চৈ চিৎকার।

যেন হীরেন অনধিকার প্রবেশ করেছে জমিতে। যেন এখনি তার গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে আচ্ছা করে কামড় বসিয়ে দেবে সারমেয় মহারাজ।

হীরেন মনে মনে হাসল। তাই তো, ঘোষেদের পোড়ো জমির একচ্ছত্র অধিপতি ছিলে তুমি, দশ হাজার টাকা দিয়ে আমি জমি কিনেছি।

দলিল পর্যন্ত হাতে এসে গেছে, পকেটে আরো এক গোছা নোট নিয়ে ফিতে হাতে ঝুলিয়ে মাপজোখ করতে এসেছি, কোথায় আমার শোবার ঘর হবে, কোথায় বসবার ঘর হবে, রান্নার জায়গা, পায়খানা কোন্‌দিকে করলে সুবিধে হবে, কত ইট লাগবে, কি পরিমাণ কংক্রীট হলে কাজের সুবিধে হবে, আমার মাথায় কেবল এই চিন্তা—অর্থাৎ কেবল সুখ সুবিধা, যাকে বলে কিনা স্বার্থচিন্তা নিয়ে আমি মগ্ন, এই অবস্থায় তুমি আমাকে অবাঞ্ছিত আগন্তুক ভাববে, শত্রু ভাববে তোমাকে উৎখাত করে দিয়ে আমি এখানে আমার মসনদ তুলব—তুমি তা সহ্য করবে কেন।

আর এক সেকেণ্ড হলে আমায় সে কামড় বসিয়ে দিত, হঠাৎ

ডেরার ভিতর থেকে নরম গলায় কেউ যেন কুকুরটাকে ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে তার চিৎকার থেমে গেল, লেজ গুটিয়ে ফেলল, ত্ব'পা পিছনে হটে থেমে গিয়ে গন্ধ শোঁকার মতন করে বাতাস শুঁকতে লাগল।

বেশিক্ষণ বাতাস শোঁকা হল না, তখন রোদের তেজ কমে গেছে, গাছের ডালে ডালে শালিক বুলবুলিদের কলরব আরম্ভ হয়েছে, ওদিকে কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে নধর এক কাঠবিড়াল, যেন পরিপাটি করে চিরুনি দিয়ে মাথা পিঠ আঁচড়ে নিচে নেমে এসেছে বৈকালিক ভ্রমণের আশায়। এমন সময় ডেরার ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে কামরাঙা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল।

আজ তাই চিন্তা করছে হীরেন। সেদিনও কথাটা বার বার মনে হয়েছিল।

অনেক সুন্দর জিনিস দেখেছে সে, চোখ জুড়ানো রূপ-লাবণ্য, সজ্জা শোভনতা প্রসাধনেরও শেষ ছিল না। তার সঙ্গে দামী হেয়ার অয়েলের সৌরভ, আতরের সুবাস, ক্রিম পাউডার সাবানের মন ভুলানো গন্ধ। কিন্তু একটু পরেই, কি সঙ্গে সঙ্গেই উৎকট ত্বর্গন্ধ নাকে লেগেছে, বমি আসার মতন? একটু পরেই কি সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছে অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যভিচারের অলজ্জ উল্লাস?

একদিন না, এক নাগাড়ে উনিশ বছর। উনিশ বছর একই সঙ্গে এত জিনিস একটি মানুষের মধ্যে কী করে হীরেন সহ্য করেছে ভেবে সময় সময় এখন তার অবাক লাগে।

যেন ঈশ্বর তাকে ধৈর্যের পাহাড় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল না কি ধৈর্যের সমুদ্র।

যাই হোক, সেদিন কামরাঙা গাছের নিচে আবার একটি মানুষকে সে দেখল, একই সঙ্গে লাবণ্য দেখল, রূপ দেখল, কিন্তু সজ্জার-পারিপাট্য শোভা কিছুই নেই, বরং পরণের ছেঁড়া ময়লা

কাপড় থেকে যেন দুর্গন্ধ উঠে আসছিল। আজ উল্লাসী গায়ে একটু সাবান মাখতে পারে, মাথায় তেলের ছিটাও পড়ে চিরুনির আঁচড় লাগে। সেদিন সে সব কিছুই ছিল না। রুক্ষ লালচে চুল, গায়ের চামড়ায় ধুলো ময়লা। অবশ্য হীরেন ভেবেছিল, নোংরা বেশ নোংরা চুল, এত এত ময়লা জমে আছে গায়ে চামড়ায়—কিন্তু সবই তো ওপরের, বাইরের মলিনতা। ভিতরটা কেমন ?

ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে হীরেন চোখ তুলে গাছের পাতায় হলদে রোদ দেখছিল। বুলবুলির নাচানাচি দেখছিল।

কি হবে আমার গাছ দিয়ে, পাখি দিয়ে। ভাবল সে তখন ঝকঝকে রোদ মুক্ত আকাশ মুক্ত বায়ু আমায় কতটা মুক্তি দেবে। সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবতী। ওপরটা নোংরা, যদি ভিতরটাও এমন হয় তবে তো যাকে বলে সোনায় সোহাগার মতন কিছু একটা হল।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স, হীরেন অনুমান করেছিল, কেন না হুলাকে তখনও সে দেখেনি, তাই জল দেখে জলাতঙ্ক রুগী যেমন পিছনে হটে, হীরেনও বুঝি ভয় পেয়ে এক পা এক পা করে জমি ছেড়ে চলে আসত। দরকার নেই আমার এখানে ঘর বাড়ি তুলে, অনেক দণ্ড দিতে হয়েছে এই জীবনে, না হয় আরো কিছু দণ্ড যাবে, দশ হাজার টাকা কিছু না, তার চেয়ে চিত্তের স্বস্তি অনেক বড়, অনেক বেশি মূল্যবান।

ভাবছিল সে, হয়তো চলে আসবার জন্য একটা পা-ও তুলেছিল, কিন্তু ওদিক থেকে ভয় পাওয়ার মতন চেহারা করে মেয়েটা বলল, কর্তাবাবু বুঝি এই জমি কিনলেন ?

হুঁ। গম্ভীর হয়ে হীরেন উত্তর করল।

তখনও গাছের পাতার দিকে চোখ দুটো ধরে রেখেছিল সে, গম্ভীর মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। তবে তার

ভিতরটা যেন শক্ত হয়ে উঠল। এই জমি তার, এখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই—এমন একটা স্বীকৃতি শুনে কিছুটা যেন শান্তিও পেল।

হুঁ এই জমি আমার, এখানে আমি ঘর তুলব, তুমি কে? হীরেন চমৎকার ভুরু কুঁচকোতে পারল। ভুরু কুঁচকে গলার স্বরটা একটু রুক্ষ করে মেয়েটার দিকে তাকাল।

অপর পক্ষ নীরব। চোখ নামিয়ে পায়ের তলার ঘাস দেখছে। না কি হীরেনের মনে হয়েছিল, তার পায়ের দিকে চোখ দুটো বরাবর ধরে রেখেছিল হুলার মা। পা জড়িয়ে ধরার কথা চিন্তা করছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক আঁজলা রক্তের মতো ক'টা টকটকে লাল ফুল বুকের কাছে ধরে রেখে নাচতে নাচতে একটি কিশোর সেখানে ছুটে এল।

হীরেন এক সঙ্গে ফুল দেখল, ছেলেটিকে দেখল। ঋজু লম্বা গড়ন, চমৎকার নাক চোখ, মাথায় থোকা থোকা চুল।

কিন্তু গায়ের রং মেয়েটির মতন ময়লা না, বেশ ফরসা, চেহারায় মিল ছিল, ভাই হতে পারে হীরেন অনুমান করল।

নাচ থেমে গেল কিশোরের, যেন হাতের ফুলের গোছাটাও পড়ে যেতে চেয়েছিল, তা হলেও সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুঠ শক্ত করে ধরে রাখলে, মাটিতে পড়তে দিল না, মাদার ফুল, হীরেন চিনল। সেবার মাঘের একদিন দু'দিন থাকতেই জমির পূবদিকের আকাশ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। সারি সারি মাদার গাছ দাঁড়িয়ে আছে ওপাশটায়। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হীরেন আবার খুঁটিয়ে ছেলেটিকে দেখছিল।

কিন্তু যুবতী যেমন ভয় পেয়েছে তাকে দেখে কিশোরের মুখেও সেই ভয়ের ছাপ। ফুল নিয়ে বেজায় খুশি মনে নাচতে নাচতে

এসেছিল। মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। হীরেনের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণে সে ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল।

তুমি কে? হীরেন প্রশ্ন করল।

আমি হুলা। ছেলেটি উত্তর করল।

আমার ছেলে। ওপাশ থেকে আর একজন সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল।

এবার হীরেন চমকে উঠল। যেন সঙ্গে সঙ্গে খুঁটিয়ে মা ও ছেলেকে দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এই বাবু-ই জমি কিনেছেন, বুঝলি। হুলার মা হুলাকে বলছিল, ঘর তুলবেন মাপজোখ করতে এয়েছেন।

হুলা ফ্যালফ্যাল করে হীরেনকে দেখল। তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। মনে হল যেন দু' মিনিটের মধ্যে সে বুড়ো হয়ে গেছে। ভারি চিন্তান্বিত দেখল কিশোরকে।

তা হলে তো আপনি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন, এই জমিতে আর আমরা থাকতে পারব না। একটু পরে মাটির দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল ছেলেটি।

হীরেন বুঝল এরাই ওই পাতার ঘরের বাসিন্দা। যেন অনেকদিন এই জমিতে কামরাঙা গাছটার নিচে আস্তানা গেড়েছে। রোদ বৃষ্টি, ঝড়ঝাপটা লেগে লেগে পাতার ছাউনি দুমড়ে মুচড়ে বিবর্ণ হয়ে প্রায় ভাঙনের দশায় পৌঁছেচে। আর একটা ঝাপটা লাগলে চালটা উড়ে যাবে, ঘরটা মাটিতে শুয়ে পড়বে।

তোরা কতদিন এখানে আছিস? হীরেন প্রশ্ন করল।

চারবছর। হুলা না, মেয়েটি বলল, ঘোষবাবুরা দয়া করে এখানে ডেরা বেঁধে থাকতে দিলেন। খোকার বাবা মরে গেল, বিপাকে পড়ে গেলাম তখন। জমিজমা ভিটেমাটি বলতে কিছু

তো রেখে যায়নি। আঁচলের খুঁট দিয়ে যুবতী চোখ মুছল।

তোমরা কী কর, আর কে আছে তোমাদের? হীরেন চোখ তুলে খোকার অর্থাৎ দুলার মাকে দেখছিল।

কেউ নেই গো কর্তাবাবু। এবার আর মেয়েটি চোখ থেকে আঁচল নামাল না। আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। লোকের বাড়ি খেটেখুটে কোন রকম তাদের দিন চলছে। ঘোষবাবুরা জমিটা বেচে দিয়েছেন, তার পর থেকে মা ও ছেলের চোখের ঘুম চলে গেছে। যিনি জমি কিনে নিলেন তিনি যদি শীগগির এসে ঘর দুয়ার তুলতে আরম্ভ করেন তো তারা কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে আবার একটা ডেরা-টেরা তুলবে ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছে না।

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি দু' পা এগিয়ে এসে ধপ করে হীরেনের পায়ের কাছে বসে পড়ল। যেন হাত বাড়িয়ে হীরেনের পা ধরতে চেষ্টা করল। ব্যস্ত হয়ে হীরেন পিছনে সরে দাঁড়াল। দয়া করে হীরেন যদি আর ক'টা দিন সময় দেয়, সুবিধে মতন একটা জায়গা-টায়গা খুঁজে মা ও ছেলে কর্তাবাবুর জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

এই প্রথম আলাপ, উল্লাসী ও দুলার সঙ্গে হীরেনের এই প্রথম পরিচয়।

হীরেন দয়া করেছিল।

না, উল্লাসীকে দেখে নয়, তার ফুটফুটে ছেলে দুলাকে দেখে তার ভাল লেগেছিল।

যেন তখনি একটা প্ল্যান, একটা চমৎকার মতলব তার মাথায় এসে গিয়েছিল। শত হোক একটি পুরুষ। দু'দিন পর তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠবে। যেন মনে মনে এমন একটি সঙ্গী সে খুঁজছিল। এখানে এসে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছিল সে নিজেকে।

অসহায় বোধ করছিল। এবার তার সাহস বাড়ল।

তারপর সারাটা ফাল্গুন—ফাল্গুন চৈত্র, দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রীদের দিয়ে ঘর দরজা তুলল, স্নানের ঘর রান্নার জায়গা করাল, পায়খানা তৈরি হল, টিউবওয়েল বসাল।

এক চোখ দিয়ে সে মিস্ত্রীমজুরদের কাজ দেখছিল, আর এক চোখ দিয়ে কামরাঙা তলায় পাতার ঘরের মানুষ দুটিকে দেখছিল।

লোকের বাড়ি খেটে খুটে এসে উল্লাসী কাঠ কাটে জল তোলে উনুন ধরায়। অর্থাৎ এবার এখানে পেটের আয়োজন, নিজের জন্য ছেলের জন্য। কিন্তু ছেলে ফুল নিয়ে মত্ত। আকাশময় রক্তের আগুন ছড়িয়ে দিতে মাদার জঙ্গলটা যেন সেবার পাগল হয়ে উঠছিল।

হীরেন কটমট করে সেদিকে তাকাত। তারপর কিশোরকে দেখত। এত ফুল কুড়িয়ে নিয়ে হুলা মা'র কাছে ছুটে এসেছে। মাকে ফুল সাধছে, মা'র হাত জোড়া, হয়ত কাদা ঘাঁটছে গোবর মাখছে, হুলা তখন নিজেই মা'র তৈলহীন রুক্ষ চুলের ভিতর দুটো লাল ফুল গুঁজে দিয়ে হি-হি করে হাসল। উল্লাসী হাসল। বনে বসন্ত, পাতার ডেরার সামনে আর এক বসন্তের প্রমত্ত লীলা দেখে হীরেনের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠত।

ভয় পেয়ে হীরেন যেন এক একবার চোখ বুজে থাকত। ময়লা বেশবাস নিয়ে এত রূপ এত যৌবন!

তা না হয় হল। কিন্তু ভিতরটা?

সেখানে কি পরিমাণ নোংরা জমা হয়ে আছে হদিস করতে না পেরে হীরেন অস্থির হয়ে শেষটায় পায়চারি আরম্ভ করে দিত। ছটফট করত। যেন তখনই বেশি করে হুলাকে কাছে পেতে চাইত।

একটি সঙ্গী। হোক কিশোর। তবু পুরুষ।

একলা পুরুষ হলে একসঙ্গে অটেল রূপ-যৌবন ও পোকা

কিলবিল করছে, মাছি ভনভন করছে, দুর্গন্ধে নিশ্বাস ভারি হয়ে উঠছে, এমন স্তূপীকৃত ময়লা আবর্জনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, প্রচণ্ড মার খেয়েছে—এখানে আবার সেই যুদ্ধ? তারপর পড়ে পড়ে মার খাওয়া?

না, এবার অন্য মতলব মাথায়।

আর একলা থাকা হবে না। চোখের ইশারায় হীরেন হুলাকে কাছে ডেকে আনত, হাতে পয়সা গুঁজে দিত। দরকার হলে মিস্ত্রীদের ওপর 'যা ভাল হয় তোমরা কর' ধরনের কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে হুলার সঙ্গে খেলাধূলায় মেতে উঠত। যেন মিস্ত্রীরা তখন অবাক হয়ে শহরের বাবুটিকে দেখত, কামরাঙা তলা থেকে উল্লাসী দেখত, দেখে অবাক হত, হয়তো মজাও পেত।

খেয়ালী মানুষ, নিশ্চয় ভাবত তারা, খুঁজলে কানের কাছে একটা, দুটো পাকা চুল পাওয়া যাবে, আর সেই বয়সে পৌঁছে কি না 'ভদ্দরলোক' একটা 'পুচকে' ছোঁড়ার সঙ্গে বনবাদাড়ে ঘুরে ফড়িং ধরছে, কুল পেড়ে খাচ্ছে কলার খোলের নৌকো বানিয়ে পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে হি-হি করে হাসছে।

এত বড় মানুষটা এমন ছেলেমানুষ হয়ে যেতে পারে কেমন করে।

হুঁ, ছেলেমানুষ, হীরেন তখন চিন্তা করত, আবার ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে সে চাইছে বৈকি।

উনিশ বছরের অশান্তি অনিদ্রা খাওয়ার অরুচি তাকে বুড়ো করে দিয়েছিল।

তবু যুদ্ধ করতে গেছে, আর বার বার হেরে গিয়ে মার খেয়েছে। তার প্রত্যেকটা স্নায়ু নড়বড়ে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়ালে ভয় হত তার। কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ বসে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে। যেন তখনই রগের কাছে বেশ কিছু পাকা চুল চোখে পড়ত। চল্লিশে পা দিতে না দিতে

ষাট বছরের বিধ্বস্ত নিঃশেষিত মূর্তি, বেশিক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারত না। বেশিক্ষণ ঘরেও থাকতে পারত না হীরেন। ছুটে বারান্দায় চলে আসত।

তার সেই ঘর। পূব কলকাতার অশোক মিত্তির লেনের দোতলার ঘরের চেহারাটা মনে হলেই হীরেনের এখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

সেই ঘরে সে যুদ্ধ করেছে, কালো বার্নিশ করা খাটের বিছানায় শুয়ে অসংখ্য অনিদ্রার রাত কেটেছে, খাওয়ার টেবিলে বসে হাজার দিন না খেয়ে উঠে পড়েছে, আধপেটা খেয়েছে, বাকি খাবার বাটিতে তুলে কুকুর বেড়ালের সামনে ঢেলে দিয়েছে।

সেই ঘর। কাশ্মিরী পর্দা খাটানো জানালা। সঙ্গে বাথ। স্নান করতে ঢুকে স্নান না করে মাথার চুল ছেড়া হয়েছে। পায়খানায় বসে শুধু আঙুল কামড়ানো হয়েছে। অশোক মিত্তির লেনের চার দেওয়াল ঘেরা সেই ভয়ংকর রণক্ষেত্র।

অনেক কাপ-ডিশ ছোড়াছুঁড়ি কাচের গ্লাস ভাঙাভাঙি, দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি। অনেক তর্জন-গর্জন, শাসানি চোখ রাঙানি, নয়তো কান্না মিনতি, পায়ে ধরে সাধাসাধি।

তা ছাড়া ছিল এসিড ঢেলে চামড়া জ্বালিয়ে দেওয়ার, রূপের জলুস ভস্ম করে দেওয়ার সাংঘাতিক সব দুঃস্বপ্ন, নয়তো খাবারের সঙ্গে বিষ মেশানোর দুরন্ত লোভ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারল কি, কিছুই না, কিছুই হল না, আদালতের রায় মেনে নিয়ে মুখ চুন করে হীরেনকে সেই চার দেওয়ালের গর্তে ফিরে আসতে হল।

তখন যুদ্ধ শেষ, রণাঙ্গন স্তব্ধ। ঘরে সে মার খেয়েছে, এবার আদালতে মার খেল, ডিভোর্সের মামলা করে তার প্রতিপক্ষ জিতে গেল।

কিন্তু তখন যেন শূন্য ঘরের বাতাস আরো ভয়ংকর মনে হতে লাগল তার, যেন জেলখানার মধ্যে আটকা পড়ে আছে সে। ছুটে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, নিচে রাস্তার মানুষ দেখেছে, দোকানপাট দেখেছে, গাড়ি ঘোড়া দেখেছে।

তার মনে হয়েছে, সব অপরিচিত নতুন। আগে কোনদিন এসব দেখেনি। যেন ঐ দোকানপাট ঘরবাড়ি গাড়িঘোড়া লোকজন—সবই একটা জেলের ভেতরের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য। গোটা অশোক মিত্তির লেনটাই জেলখানা। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হত, জেলের ধোঁয়াটে রঙের বিশাল প্রাচীর ওটা।

সেখান থেকে পালিয়ে শ্যামবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আশ্চর্য, তার হয়েছে, সেটাও জেলের আর একটা কুঠুরি, আর একটা সেল্।

মামলা চুকে যাবার পরে দিন সাতেক সে ছিল কলকাতায়। এপাড়া ওপাড়া যেখানেই গেছে, তার মনে হয়েছে জেলের মধ্যেই আছে সে, কেবল ঘর বদল করছে, সেল্ পাল্টাচ্ছে, সব পাড়ার এক চেহারা, সব বাড়ির এক রং। জেলের রং।

তারপর এখানে পালিয়ে এসেছে।

এখানে সব ভাল ছিল। আকাশ প্রান্তর গাছ পাখি রৌদ্র বাতাস—সব কিছুর মধ্যে মুক্তির স্বাদ, স্বাধীনতার আনন্দ।

কিন্তু এক জায়গায় তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। আবার রমলা? সেই রূপ-যৌবন, মুহুর্মুহু লালসা জাগাবার মতন কোমর বুক, কালো অগ্নিগর্ভ চোখ?

রমলার মতন সাজ-পোশাক নেই প্রসাধন নেই। তা হলেও তো যুবতী নারী। হীরেন ভাবনায় পড়ল। রমলার মতন এই মেয়ের চামড়ার নিচে কত রকম বিষ আছে, ময়লা আছে, পোকা আছে, মাছি আছে কে জানে?

এই জন্যই হুলাকে কাছে টানা। দোসর রাখা ভাল। হীরেন তৈরি থাকবে। যদি আবার লড়তে হয়। একলা পড়ে পড়ে মার খাবে? না, আর তা হতে দিতে সে রাজী নয়। এদিকে একটা মেয়েকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিরাশ্রয় করার মতন কাপুরুষতাও সে পছন্দ করল না।

থাক কামরাঙা তলার পাতার ঘর, যেমন এতদিন ছিল। ওই ডেরা বাদ দিয়েও দশকাঠার জমিতে সে নিজের ইমারৎ তুলতে পারবে।

তবে কি না এই ফুরফুরে আলো হাওয়ার দেশে এসে সে নিজেকে যেমন নতুন করে ঢেলে তৈরি করছে, হুঁ, একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যাবার ইচ্ছা, যেন গোড়া থেকে আবার জীবন সুরু হল, তা না হলে কোন যুবতীর সঙ্গে লড়তে পারবে না, অশোক মিত্তির লেনের বাড়িতে যেমন হয়েছিল, বার বার হেরে যাবে আর মার খাবে, তেমনি মনের মতো ছাঁচে ফেলে হুলাকেও তৈরী করবে সে।

হুলা তার হাতের অস্ত্র হবে। ঝকঝকে একটা তলোয়ার। খাঁটি ইস্পাতের ফলা। ফুল ভালবাসছে, একদিন নিজের হাতে ঐ ছোঁড়া ফুলগাছ কেটে শেষ করবে, পাখি ভালবাসছে, একদিন পাখির গলা টিপে মেরে কি পাখা কেটে দিয়ে আনন্দ পাবে।

মা ও ছেলে? তাতে কি।

যদি তেমন করে হীরেন ছোঁড়াকে গড়ে তুলতে পারে তো এই ছেলেই একদিন উল্লাসীর গলা কাটবে।

সত্যি, কী ভীষণ একলা ছিল সে, অসহায় নিরস্ত্র, নিতান্তই ভালমানুষ এক স্বামী। একটা পেন্সিল কাটা ছুরি পর্যন্ত রাখত না ঘরে। রমলা তার সুযোগ নিয়েছিল।

হুঁ, হীরেন কেবল এসিডের স্বপ্নই দেখেছে, যেন বোতল বোতল

এসিড এনে ঘরে জমা করেছে, একদিন সব বৌয়ের গায়ে ঢেলে দেবে।

হীরেন কেবল পাঁয়তারা কষেছে, খাবার সঙ্গে লুকিয়ে বিষ মিশিয়ে রাখবে, ওই খেয়ে রমলা একদিন ছটফট করে মরবে। এদিকে একসঙ্গে খেতে বসে বৌয়ের পাতে একটা মাছি বসেছে দেখলে হাত পা ছুঁড়ে কত শীগগির ওটা তাড়ানো যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠত।

কাজেই সব কিছুর সুযোগ নিয়ে নিজের মতন করে চলতে রূপসী স্ত্রীর একটুও অসুবিধা হত না।

সেই রাগ, আক্রোশের জ্বালা হীরেন ভুলতে পারে কখনও! এখানে এসে আবার এক রূপসীকে দেখে বুকের ভিতর দাউ দাউ করে উঠল।

কিন্তু এবার হীরেন মনে মনে হেসেছিল।

আর সে নিরস্ত্র নয়, অসহায় নয়।

৩

তবে কি না তার রসুলপুরের জীবনের গোড়ার দিকের ভাবনা এসব।

আসলে উল্লাসী যে অন্য মানুষ তখনও হীরেন বুঝতে পারেনি।

যখন বুঝল তখন তার হাতের অস্ত্র তৈরী হয়ে গেছে, এক দেড় বছরেই হলো রীতিমত যোয়ান মরদ—কাঁধ উঁচু হয়েছে, ছাতি চওড়া হয়েছে, গোঁফের রেখাটা মোটা হয়ে প্রায় কালো রং ধরেছে।

ফুল গাছ দেখলেই ছোড়ার হাত নিশপিশ করে, কতক্ষণে কুড়ুল কাটারি চালাবে, পায়রা মুরগি দেখলে ধারালো ছোরাটা বাগিয়ে ধরে।

দেখে হীরেন সুখ পায়।

কিন্তু উল্লাসী যে বড় বেশি নরম ভীরু মেয়ে, ফুলের মতন

পাখির মতন। নরম পরিচ্ছন্ন। ভিতরে ময়লার লেশমাত্র নেই। পোকা থাকবে কি বিষ থাকবে কি, সবটাই মধু।

সব দেখে শুনে হীরেন তাকে ঘরের কাজে লাগিয়েছে।

এই রূপ-যৌবনের কাছে ভয়-দুশ্চিন্তা ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা একেবারে শূন্যের ঘরে। এমন মানুষকে ঘরে রেখে চোখ বুজে দিন কাটানো যায়।

তাই কাটাচ্ছে হীরেন, উল্লাসী জল তুলছে, রান্না করছে, বাসন মাজছে। কেবল তাই না, সব দিকে হুলার মা'র চোখ, বাগান পুকুর, ধান চাল, হাঁস মুরগি, গরু ছাগল নিয়ে প্রকাণ্ড সংসার ছড়িয়ে বসেছে হীরেন, উল্লাসী সব আগলে রাখছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না, উল্লাসী যতক্ষণ আছে এক আঁটি খড়ও খোয়া যাবে না, হীরেন বুঝে গেছে।

আর তার অশোক মিত্তির লেনের এতটুকু সংসার। পাখির বাসার মতন এইটুকুন বাসা। ঝড়ের ঝাপটা লেগে সারাক্ষণ কাঁপত দুলত, কখন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, কখন গাছের ডাল থেকে টপ করে নিচে খসে পড়ে বাসা ভেঙে তছনছ হয়।

তাই তো হল একদিন। হীরেনের বাসা ভেঙে গেল। ভেঙে গেল কি? একটা মানুষের গরম নিশ্বাস লেগে বাসা পুড়ে গেল।

অনেক সাধ করে ওই বাসা বেঁধেছিল সে। তার প্রথম যৌবনের এত এত রং নিয়ে নেশা নিয়ে গড়া আহ্লাদের সংসার।

অথচ এত ছড়িয়ে-টড়িয়ে এখানে সংসার পেতে বসেও কি না হীরেন ভারি নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। এখানে যে জ্বালা নেই, হিংসা নেই। এখানে রমলা নেই। উল্লাসী শিশিরের ফোঁটার মতন ঠাণ্ডা।

তাই কোনোদিনই তার এই সংসার ভাঙবে না, পুড়বে না।

হুঁ, শিশিরের ফোঁটার মত ঠাণ্ডা, ফুলের মতো পরিচ্ছন্ন সুন্দর, পাখির মতন নরম ভীরু—উল্লাসীকে যেদিন বুঝতে পারল, সেদিন

হীরেন কেমন যেন একটা হোঁচট খেল, অপ্রস্তুতও হল কম না।

তাই তো, এদিকে যে অস্ত্র তৈরি হয়ে গেছে। হুলা রীতিমত একটা খড়্গ হয়ে উঠেছে। যেমন তাকে ছাঁচে ফেলা হয়েছে। হীরেন যেমন চেয়েছে।

কিন্তু এই অস্ত্র হীরেন কোন্ কাজে লাগাবে। এখানে লড়াই নেই, আক্রোশের জ্বালা নেই। এখানে নিষ্ঠুর হবে কে, হিংসার আগুন ছড়াবে কে! ফুলের জন্য উল্লাসী কাঁদে, মুরগির গলা টেনে ছেঁড়া হচ্ছে দেখলে ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

যেমন এখন। অনেক কাকুতি-মিনতি করেছে উল্লাসী। বাড়ির পোষা মুরগি এমন করে মারতে নেই। দেবতা রাগ করবে, হুলার অকল্যাণ হবে। ছেলের হাতে ধরে নাকি উল্লাসী বোঝাতে চেয়েছিল—হুঁ, হীরেনের অসাক্ষাতে এসব হয়েছে, হুলা ঝটকা মেরে মা'র হাত ছাড়িয়ে চলে এসেছে। কর্তাবাবু যেমন বলছে তেমন তাকে করতে হবে, কর্তাবাবুর ইচ্ছা তার ইচ্ছা। উল্লাসীর কথার দাম আছে না কি এখানে?

কেমন ভাল করিনি! হীরেনের চোখের দিকে চেয়ে হুলা হি-হি করে হাসছিল। আচ্ছা করে মা বেটিকে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।

হীরেন অল্প হেসে মাথা নাড়ছিল।

তারপর হুলা হাত বাড়িয়ে খপ করে লাল ঝুঁটিওলা মোরগটাকে ধরেছে, তারপর, যেন পানের বোঁটা ছিঁড়ছে গলাটা একটানে আলগা করে ফেলল, ধড়টা বাঁ হাত দিয়ে চেপে রাখল। এক ফোঁটা রক্ত না বেরোয়। হীরেন যেমন শিখিয়েছে। রক্তের সঙ্গে তেল বেরিয়ে আসে। মাংসের স্বাদ কমে যায়। মাথাটা কামরাঙা গাছের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হুলা আবার হি-হি করে হাসল। কাকের দল সোরগোল তুলে কামরাঙার ডালে এসে উড়ে বসল।

তাই, হীরেন ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল, ক'দিন থেকেই ভিতরে

ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিল, এমন চমৎকার অস্ত্রটা কোন কাজে লাগল না, হুলা কেবল ফুলগাছ কাটবে আর মুরগি পায়রা মারবে —এটা কোন কাজের কথা না। অন্য মতলব ছিল হীরেনের, আরো বড় কাজে লাগাত হুলাকে সে। যে জন্য ছোড়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে তোলা।

সময়মতো কাজে না লাগালে অস্ত্রে মরচে ধরে, সময়মতো যুদ্ধে না পাঠালে সৈন্য বিগড়ে যায়, শিকারী কুকুর—তা যত বাঘা কুকুর হোক, ঘরে বসিয়ে রাখলে, শিকার ধরতে না দিলে অলস হয়ে পড়ে, বেতো রুগীর মতন ঘর থেকে পরে আর নড়তেই চায় না, নয়তো পাগল হয়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি মানুষকে কামড়াতে শুরু করে। বিকার আসবেই।

এই ভয় হীরেন করছিল।

যেমন তাগড়া হয়ে উঠেছে ছোঁড়া।

বেশ বোঝা যায়, সারাক্ষণ হুলার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। যখন তখন চোখে লালচে ছিটে দেখা যায়।

যেন মাথায় একটা খুন নিয়ে এদিক ওদিক সে ছুটোছুটি করছে। হাতের কাটারিটা বন্‌বন্‌ করে ঘোরাচ্ছে, মাদার অতসী ঝুমকো করবী, বাড়ির আশে-পাশে যত ফুলের গাছ—সব কেটে সাবাড়, যেন হুলা দিশা করতে পারছে না, তারপর কী কাটা যায়, কোন্‌ গাছে কোপ বসাবে। তার হাত নিশপিশ করছে, কপালের রগ ফুলে ফুলে উঠছে, রক্তের ছিটা নিয়ে চোখের তারা কটমট করছে, মুহুর্মুহু গরম নিশ্বাস ফেলছে।

সেদিন বাগানের লিচু গাছটাই কাটতে আরম্ভ করেছিল। সবে ফুল এসেছে। দুদিন পর গুটি বেরোবে।

গাছ কাটার শব্দ শুনে হীরেন হা-হা করে ছুটে গেছে।

না, ওটা কাটতে হবে না, উল্লাসীর ছেলেকে সে ধমক

লাগিয়েছিল, ফলের গাছ তোকে কাটতে কে বলেছে, ধমক খেয়েও কিন্তু হুলা আরো দুটো কোপ বসিয়েছে, হীরেন তখন তার হাতের কাটারি কেড়ে নিয়েছে।

তাই হয়, হীরেন দুশ্চিন্তা করছিল, এই বয়সে রক্তের ধমক বাগ মানানো মুশকিল। একবার তুমি তাকে লেলিয়ে দিলে তারপর তাকে ফেরানো—কষ্ট তো বটেই, বিপদও আছে।

যেন ক'দিন ধরে এমন হচ্ছিল, নিজের মর্জি নিয়ে হুলা একটা কাজ করতে গেছে, হয়তো হীরেন সেটা পছন্দ করল না, হুলাকে বাধা দিতে গেলে সে উল্টে তর্ক করেছে, যেন কর্তাবাবুকে চোখ লাল করে উঠতেও ছোঁড়ার আটকায়নি।

হাঁস মুরগি পায়রা সমানে কাটা হচ্ছে। হীরেন মাংস খেতে ভালবাসে। রোজ তার মাংস চাই। সেসব বধ করছে হুলা। এই কাজে তার আনন্দ কত।

গোড়ায় হীরেন তাই চেয়েছিল। পাষাণের মতো কঠিন হয়ে উঠুক ছোঁড়া, দয়া মায়ার ছিটেফোঁটাও ভিতরে থাকবে না, দয়ামায়া থাকলে অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে পারবে না, অন্যায়ের টুঁটি টিপে মারতে হলে নৃশংস হতে হবে।

যেমন হীরেন, অনেক অন্যায় দেখল অশোক মিত্তির লেনের বাড়িতে, দেখে সব অন্যায় হজম করল, সময় সময় তর্জন গর্জন করেছে সে, চোখ লালও করেছে বিস্তর, লম্পঝম্প করেছে, শাসিয়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তাতে অন্যায় দমবে কেন, অন্যায় হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকেনি, সে তার কাজ করে গেছে।

হীরেন এক একদিন ভাবত। না, খুব অবাক হত না আর, অবাক হবার দিন চলে গিয়েছিল, শুধু ভাবত এবং মনে মনে হিসাব করত, রমলার ক'ডজন গানের গুরু আছে, বন্ধু আছে, এক ডজন, দু'ডজন, তিন ডজন? না, যেন তারও বেশি, কেন না রোজই

নতুন নতুন নাম শোনা যেত রমলার মুখে, সবাই আর্টিস্ট, কারো গানের গলা, কারো বেহালা বাজাবার হাত, কেউ সেতারে এক্সপার্ট, কেউ তবলায়।

নিজে আর্টিস্ট হয়ে, গানবাজনা নিয়ে ডুবে আছে বলে রমলাকে অমুকের কাছে যেতে হচ্ছে এটা শিখতে, তমুকের কাছে যেতে হচ্ছে ওটা শিখতে, সব কিছু তাকে যে শিখতে হবে।

আর এই বিদ্যা বড় সাংঘাতিক বিদ্যা, শেখার শেষ নেই, সারা-জীবন শিখেও বলতে হয় 'সমুদ্রবেলার গুটি কয়েক নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র—তার বেশি কিছু হয়নি।'

কাজেই রমলা আজ অমুকবাবুর কাছে গেছে সরোদের একটা গত তুলে আনতে, কাল তমুকবাবুর কাছে গেছে একটা গানের সুরের জন্য—হীরেন কোনদিন বাধা দিয়েছে কি, কেন দেবে, বরং গোড়ায় তারই উৎসাহ ছিল, বিয়ের আগে যদি রমলার গানবাজনার চর্চা ছিল তো বিয়ের পর এই জিনিস ছেড়ে দেবে কেন, কোন অর্থ হয় না ছেড়ে দেবার, বাজনার হাত আছে, গানের গলা আছে, কাজেই সব ছেড়েছুড়ে, যেহেতু বিয়ে হয়েছে, এখন থেকে হাঁড়ি ডেকচি নিয়ে সে পড়ে থাকবে—হীরেনের ঘোর অপছন্দ।

বাজনার দোকানে গিয়ে হীরেন নিজে খরচ করে দু' তিন রকম বাদ্যযন্ত্র কিনে এনেছে, স্বরলিপির বই কিনে দিয়েছে বৌকে।

হুঁ, মাস্টার। একজন মাস্টারও হীরেন রেখেছিল। যেন রমলা তখন মনে মনে হেসেছিল। একজন মাস্টার তাকে কত শেখাবে। এমন না যে সবে তার হাতেখড়ি সুরু। এই অমৃত সে আগেই পান করেছে, চুমুক দিয়ে একটুখানি খেয়ে এখন তৃপ্তি পাবে কেন, জালা জালা অমৃত পেলে সে খুশি হয়; দশজন মাস্টারের কাছে শিখতে পারলে তবে তার তৃপ্তি।

কিন্তু দশটা মাস্টার রাখা সম্ভব না। এত পয়সা কোথায়।

যেন এই কথায়ও রমলা হেসেছিল। বিয়ের আগে রমলা একজন না, কয়েকজন মাস্টারের কাছে গানবাজনা শিখত। তাঁরা কিন্তু কলকাতা শহর ছেড়ে চলে যাননি। হীরেনের ঠিক করে দেওয়া মাস্টার তো রইলই, রমলা তাঁদের কাছে গিয়ে গিয়ে শিখবে। পয়সা দিয়ে বাড়িতে সকলকে ডেকে আনতে হবে না।

মাস্টার অর্থাৎ গুরু, আবার তাঁরা রমলার বন্ধুও, একটা অবস্থায় পৌঁছে গুরু শিষ্যের বা শিষ্যার সম্পর্ক যে বন্ধুত্বের সম্পর্কে এসে দাঁড়ায় এ কথা কে না জানে।

আজ রমলার বিয়ে হয়ে গেছে বলে তারা কি মুখ বেঁকাবে, মোটেই না, বরং আদর করে রমলাকে এটা ওটা দেখিয়ে দেবে, শিখিয়ে দেবে। এখন আরো বেশি আদর করে, যত্ন করে শেখাবে, যেহেতু রমলা দূরে সরে এসেছে, পরের ঘরে এসেছে, আর একটা মানুষের জিম্মায় চলে এসেছে।

এখন যেন তাঁরা ওপক্ষের মানুষ, যেমন রমলার বাবা মা ভাই বোন মেসো খুড়ো এবং আর পাঁচজন। কাজেই সেসব গুরুরা, বন্ধুরা রমলাকে মাঝে মাঝে কাছে পেলে যে কত খুশি হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই স্নেহের সম্পর্ক, প্রীতির সম্পর্ক কোনদিন মুছবার নয়। রমলা মুছতে দিতে চায়ও না। এমন কি বিয়ের আগেই তারা কেউ কেউ বলেছিল, আবার আসবে, আমাদের একেবারে ভুলে যেও না, তোমার মতো ছাত্রীকে সারাজীবন শিখিয়েও আনন্দ।

হীরেন আপত্তি করেনি।

তাই তো, এই বিদ্যা, যার নাম সঙ্গীতশাস্ত্র—এক জীবনে যা শিখে শেষ করা যায় না, রমলা যদি আরো পাঁচজনের কাছে শিখতে চায়, হীরেন বাধা দেবে কেন।

বাধা দেয়নি। খুশি মনে অনুমতি দিয়েছিল।

কিন্তু, একটা জিনিস তার খুব অদ্ভুত লাগত, রোজই রমলার মুখে নতুন নতুন নাম শুনত। শুনে শুনে হীরেনের মনে হত, বেহালা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণেশ্বর—ওদিকে নারকেলডাঙ্গা থেকে ধরে হাওড়া, আরো দূরে—শালখে কদমতলা—সর্বত্র, চতুর্দিকে রমলার পরিচিত সঙ্গীত-গুরুরা, গানবাজনার বন্ধুরা ছড়িয়ে আছে।

আর তারা সকলেই পুরুষ, রমলার মুখে যেমন যেমন নাম শুনত।

কাজেই রমলা আজ বেহালা যাচ্ছে, কাল দক্ষিণেশ্বর ছুটছে, পরশু শালখে—দূরের দূরের পাল্লা।

আর একটা মজা—অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হীরেন দেখল রমলা ফেরেনি। এই জন্য ডুপ্লিকেট চাবি করা হয়েছিল, কারণ কোনদিনই রমলা এসময় বাড়ি থাকে না, কিন্তু হীরেনের হঠাৎ মনে পড়ত, তাই তো, সকালে রমলা যেন কদমতলার কথা বলেছিল, আজ কদমতলায় যাবে অমুকবাবুর কাছে বেহালার একটা নতুন গৎ শিখতে। কাজেই, তার ফিরতে রাত হবে। কাজেই হীরেনকেও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না রমলা ঘরে ফেরে।

ঝি এসে বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে কুঁজোয় বালতিতে জল তুলে এক সময় চলে যায়।

খাবারটা অবশ্য ওবেলাই, রমলা যা হোক করে তৈরি করে রেখে যেত। হুঁ, ঝি চলে যেত—তখন হীরেন সম্পূর্ণ একলা।

না, তাদের সন্তান হয়নি, আজও হল না কালও হল না—কোনদিনই হল না, তারপর তো পাখির বাসা ভেঙেই গেল।

আজ হীরেন ভাবে, ছেলেমেয়ে না থেকে ভালই হয়েছে।

থাকলে এই রসুলপুর এসে হীরেন যে আজ অখণ্ড মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে সেটা যেন হত না।

সেদিন অবশ্য, অর্থাৎ রমলা যতক্ষণ না ঘরে ফিরত, হীরেনের

বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করত, এটা একেবারে গোড়ার দিকের কথা যদিও, যেন তার তখন মনে হত, দুটো একটা বাচ্চা থাকলে সন্ধ্যেটা ওদের নিয়ে দিব্যি কেটে যেত। এমন গালে হাত দিয়ে ভূতের মতন শূন্য ঘরে চুপ করে বসে থাকতে হত না। কিন্তু উপায় কি, একলা ঘরে চুপচাপ বসে থেকে তাকে মশার কামড় খেতে হত।

অশোক মিত্তির লেনের মশা কি সংখ্যার দিক থেকে, কি বদমাইশির দিক থেকে, তাদের তুলনা ছিল না। সন্ধ্যা হতে ঝাঁককে ঝাঁক এসে ঘরে চড়াও হয়েছে, আর গায়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ইন্‌জেকশন চালিয়েছে।

প্রথমটা অসম্ভব জ্বালা, তারপর বিশ্রী চুলকানি। কেমন গা ঘিন-ঘিন করা চুলকানি। একটা কামড়ের জের দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। আর সেই জায়গায় কি না লাখ লাখ মশা হাজার-বার করে হাতে পায়ে কপালে পিঠে সুঁচ ঢোকাচ্ছে।

কি শীত কি গ্রীষ্ম। বর্ষাকালে তো কথাই নেই। বাজার থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত মশা মারা ওষুধ কিনে এনে ঘরে ছড়ানো হয়েছে, ধূনো জ্বেলে রাখা হয়েছে, ডিসেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডার রাতেও পুরো স্পীড দিয়ে পাখা খুলে রেখে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, কিছুতেই কিছু হয়নি, অশোক মিত্তির লেনের মশককুলকে কাবু করা যায়নি। দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং বদমাইশি চরমে পৌঁছেছে।

তবে কি না একলা ঘরে মশাদের নিয়ে, যেমন ক্রমাগত চড় চাপড় বসানো বা ফ্লীট ছড়ানো এবং তারপর বেগতিক দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে অনবরত পায়চারি করা—সময়টা কাটত মন্দ না।

রাত আটটা বাজত, নটা বাজত, দশটা, এগারোটা। হীরেন মনে মনে হাসত।

যেমন বাচ্চা কাচ্চা থাকলেও এভাবে সময়টা কেটে যেত। মা আসছে না কেন, মা কখন আসবে—ক্রমাগত তারা চেঁচামেচি করত,

আর ক্রমাগত তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, অথবা তাদের কাঁখে—পিঠে তুলে পায়চারি করে হীরেনকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে হত : আসবে এখনি এসে পড়বে, ঐ যেন আসছে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ইত্যাদি—

অবশ্য তার পরেও ঘণ্টা দেড়েক পার হয়েছে, রাত সাড়ে বারোটা, তখন যদিও নিচে সিঁড়িতে মেয়েছেলের পায়ের চটির শব্দ শোনা গেছে।

মোটের ওপর ঝাঁককে ঝাঁক মশার আক্রমণ ও তাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার ব্যাপারটা যদি না থাকত তো সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা—কেবল গালে হাত দিয়ে চুপ করে চেয়ারে বসে কাটানো, একদিন না, দিনের পর দিন, ধরতে গেলে বিয়ের মাস থেকে আরম্ভ করে একটানা উনিশ বছর—কেমন করে সম্ভব হত হীরেন ভেবে পেত না।

এবং শেষ দিকে তো সে তার ঘরের মশাদের রীতিমত ভালবাসতেই আরম্ভ করেছিল, হাসিমুখে তাদের কামড় সহ্য করত, চড় চাপড় দিত না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ত না, তার মনে হত মশারাই তার সঙ্গী বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জন।

তারা তাকে পাগল করছে না, বরং তারা আছে বলে স্থির শান্ত সমাহিত থেকে দুপুর রাতে সাধ্বী স্ত্রীর ঘরে ফেরার অপেক্ষা করতে পারছে সে। মশাদের অবিশ্রান্ত ভনভন শব্দ কানে না এলে এতটা দীর্ঘ সময় পাথরের মতন ভারি হয়ে তার বুকে চেপে বসত, অশোক মিত্তির লেনের ঘরে মশা না থাকলে হীরেন বদ্ধ পাগল হয়ে যেত। এটা তার এদিকের ভাবনা যদিও।

হুঁ, যে কথা হচ্ছিল—আর একটা মজা হত তখন। রোজ। আজ রমলা কদমতলা গেছে তো, কদমতলা বাদ দিয়ে অন্য চৌদ্দটা জায়গা থেকে, আরো বেশি, সন্ধ্যার পর থেকে রাত বারোটা—

ক্রমাগত টেলিফোন বেজে চলেছে, রমলাকে খোঁজা হচ্ছে। রমলা দেবী আছেন? রমলাদি আছে? মিসেস সান্যাল আছে? আচ্ছা, উনি কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

কদমতলা কদমতলা কদমতলা—প্রত্যেকবার রিসিভার তুলে হীরেনকে এক উত্তর দিতে হয়েছে এবং বলতে হয়েছে, ওর ফিরতে রাত হবে।

কখন বেরিয়েছে বলতে পারেন?

তা ঠিক বলতে পারব না, আমি অফিসে ছিলাম।

আপনি কে?

আমি মিঃ সান্যাল। আপনি? হীরেন পাল্টা প্রশ্ন করেছে।

আমায় আপনি চিনবেন না।

না, তা হলেও নামটা যদি বলেন তো রমলাকে বলতে পারব।

থাক, আমি আবার ডাকব, উনি ফিরে আসুন, আমি আর একবার বরং রিং করব। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে হীরেন হাসত। কেউ নাম বলছে না, 'আপনি আমাকে চিনবেন না'—জিজ্ঞেস করলে সকলের এক উত্তর। অথচ, রমলা রোজ বাড়ি থেকে বেরোবার আগে একটা করে নাম হীরেনকে শুনিয়ে রাখে! অমুক বাবুর কাছে যাচ্ছি। আমার গানের মাস্টার, আমার বন্ধু। তার কাছে গিয়ে আজ সেতার রেওয়াজ করব। সেতার, এস্রাজ, বেহালা, গীটার স্বরোদ সব শিখছিল সে।

যাই হোক কাল কদমতলা গেছে, আজ হয়তো গেল আলীপুর। সন্ধ্যা সাতটা থেকে আরম্ভ হল মশার ভনভন ও একটু পর পর টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং—আজ আর আলীপুর থেকে কেউ রিং করল না। বাকি চৌদ্দ জায়গা থেকে ফোন আসছে। মিসেস সান্যাল আছেন? রমলাদি আছে? রমলা দেবী? তিনি কখন

ফিরবেন? কোথায় গেছেন? আমাকে চিনবেন না। আর একবার আমি বরং রিং করব। ছেড়ে দিলাম।

হীরেনও টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে নিজের মনে হেসেছে। প্রত্যেকবার। আগের দিন যা করেছে। আগামীকাল সন্ধ্যার পর তাই করবে, পরদিন, পরদিন—এবং দিন দিন রমলার গুরুর সংখ্যা, বন্ধুর সংখ্যা হু হু করে যে বেড়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ কি।

চিন্তা করে হীরেন ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসিটাকে আরো প্রসারিত করে দিত, যেন ঐ অবস্থায় রমলার নাক চোখ ভুরু বুক কোমর উরু পিঠ কাঁধ—শরীরের প্রত্যেকটা অংশ আলাদা আলাদা করে মনে করতে চেষ্টা করত।

অর্থাৎ নিভৃত অন্ধকারে বসে আলো নিবিয়ে ঘরটা অন্তত কিছুক্ষণ অন্ধকার করে রাখত হীরেন, তাতে তার চিন্তা-টিন্তাগুলি খেলত ভাল, হুঁ, একলা অন্ধকারে বসে সে বিচার করতে আরম্ভ করত, রমলার শরীবের কোন্ জায়গাটা বেশি সুন্দর, শরীরের কোন্ অংশটা পুরুষকে বেশি আকর্ষণ করে।

তার কারণ, হীরেন ভাবত, সব পুরুষের চোখে রমলার কাঁধের বাঁকটা ভাল লাগবে, কি সব পুরুষের চোখেই তার কোমরের কাছে পিঠের ঢালু অংশটা সুন্দর লাগবে, কি সকলেই তার চোখ জোড়ার কি কেবল উরু দুটোর তারিফ করবে, কি কেবল তার পাতলা গোলাপী ঠোঁটের হাসি দেখেই আর্টিস্টের দল মুগ্ধ আর কিছু তার দেখতে চাইবে না—এ হতেই পারে না!

তবে আর আলাদা রুচি আলাদা মেজাজ আলাদা পছন্দ বলা হয় কেন—এক একজনের এক এক রকম দৃষ্টি। কোন সুন্দরীর তিল ফুলের মতো অপরূপ নাকটি দেখে পৃথিবীর পুরুষকুল মজেছে, কি তার চুলের সৌন্দর্য দেখে তারা পাগল—এক সন্ধ্যার অদর্শনে অস্থির হয়ে

টেলিফোনে সবাই তাকে ডাকাডাকি করতে লেগে যায়, জগতের সুন্দরীদের ইতিহাসে একথা লেখে কি!

এমনও হতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না, রমলার সামনের দিকে উপরের পাটির একটা দাঁতের মাথা একটু ভাঙা, বিয়ের পর থেকেই হীরেন যা দেখে আসছিল—সেই ভাঙা দাঁতটা দেখে রমলার কোন গুরু কি বন্ধু, বলতে গেলে প্রায় উন্মাদ।

আবার, হীরেন চিন্তা করত, রমলার চোখ দুটো চেরা পটলের মতন, যাকে বলে পটল-চেরা চোখ, তেমনি আয়ত গভীর, ভুরু জোড়াও অনবদ্য, কিন্তু তা হলেও চোখের মণি দুটো কটা, বেশ কটা, কারো কারো চোখে বা অনেকের চোখেই এটা যদি রমলার সৌন্দর্যের ত্রুটি বলে মনে হয় তো বলার কিছু থাকে না।

আবার কেউ যদি, তিনি শালখের হোন কি দক্ষিণেশ্বরের আর্টিস্ট হোন, রমলার এই কটা চোখ দেখে রীতিমত কামার্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তো তাকেই বা দোষ দেবে কে। কেউ না।

এমন হয়।

একজনের চোখে যা অসুন্দর, আর একজনের চোখে সেটাই সৌন্দর্য।

এখন, রমলার কোন্ জিনিসটা কে পছন্দ করছে, বলা মুশকিল। অনেকটা রহস্যের মতন।

এই জন্যেই হীরেন অন্ধকার ঘরে কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে নিজের মনে হাসত। না কি সবাই রমলার সব কিছু নিয়ে মেতে আছে, ভাবত সে।

তার নিজের বেলায় রমলার শরীরের কোন্ অংশটা বেশি সুন্দর লাগত, এখন না, আগে, বিয়ের পরে এই দিন দশ বারো, কেননা তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল রমলার অনেক প্রার্থী, অনেকেই হাত বাড়িয়ে আছে, বিয়ের আগে থাকতেই ছিল, বিয়েটা যেন একটা

পাসপোর্ট—তার পর থেকে এর ওর তার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার আর কোন ভয় ছিল না। রমলার ভয় এমনিও ছিল না—সেদিক থেকে ঈশ্বরই নিজের হাতে রমলার হাতে পাসপোর্ট তুলে দিয়েছিল, কোনদিনই তার পেটে বাচ্চা এল না—যাই হোক, সেদিন রমলার কী দেখে সে মুগ্ধ হত—হীরেন চিন্তা করত, যেন মনে করতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলত—অথচ রমলার মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের নখ—শরীরের এমন একটি অংশ বাকি ছিল না, যা হীরেনের অচেনা ছিল। সে স্বামী, প্রকাশ্য গোপন সব ক'টা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে দেখার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার ছিল।

কিন্তু পরে কিছুই আর মনে করতে পারত না, সব গোলমাল হয়ে যেত। এইজন্য তার দুঃখও ছিল না। বরং ঠোঁটের হাসিটা আর একটু গাঢ় করে, মেরুদণ্ড শিথিল করে চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে হীরেন তার ঘরের মশাদের কলগুঞ্জন শুনত।

আগেই বলা হয়েছে, এদিকে মশার কামড়টা তার খারাপ লাগত না। তার যেন মনে হত, চামড়ার স্পর্শকাতরতা বলে একটা কথা আছে, সেটা আর তার ছিল না, কাজেই মশা তাড়াবার জন্য ক্রমাগত গায়ে চড় চাপড় বসানো বা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পায়চারি করা—এসব কিছুরই তার দরকার হত না। বরং কেমন যেন আত্মসমাহিত হয়ে রমলার চিন্তায় ফিরে যেত।

না, রমলার সঙ্গে এক বিছানায় সে আর শুত না। অনেক দিন আগেই এই জিনিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক সঙ্গে শুতে গেলে রমলা খিটখিট করত, তার কারণ, সম্ভবত খুব ক্লান্ত হয়ে রমলা ঘরে ফিরত। ক্লান্ত বিধ্বস্ত, নিঃশেষিত প্রায় একটা চেহারা নিয়ে রাত বারোটা সাড়ে বারোটায় সে যখন ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে একটা কথা বলতে পর্যন্ত হীরেনের সাহসে কুলোত না।

আগে এই নিয়ে সে শাসাত, চোখ রাঙাত গর্জন করত, বাথরুমে

গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ত। পরে আর সে এসব করত না। কেননা ততদিনে সে বুঝে গিয়েছিল, এত ক্লান্ত হয়ে এমন নিঃশেষিত হয়ে রমলা রোজ ঘরে ফেরে কেন।

রমলা যে বুদ্ধিমতী তাতে সন্দেহ ছিল কি। এতটা ক্লান্তি অবসাদ নিয়ে দক্ষিণেশ্বর বা বেহালায় যদি রাতটাও সে থেকে যেত, হীরেন কিছুই বলত না। বলাবলির দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

রমলাও এটা বুঝত, তবু রাত যত গভীর হোক, ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে, ট্রামবাস বন্ধ হয়ে গেলে অন্তত একটা রিকশা ডেকে ঘরে ফিরে এসেছে। ট্যাক্সি করে রমলাকে কোনদিন ফিরতে দেখা যায়নি। নিশ্চয় তারও একটা কারণ ছিল। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার মধ্যে একটা বড়মানুষী গন্ধ আছে একটু বিলাসিতার ঝাঁজ আছে। রমলা তা পছন্দ করত না, নিশ্চয় সে এটাই দেখাতে চাইত, সে ছাত্রী, গান-বাজনার তপস্যা নিয়ে ডুবে আছে। কষ্ট করে এ সব বিদ্যা শিখছে, কষ্ট করে ট্রামে বাসে ঝুলে মাস্টারদের বাড়ি, বন্ধুদের বাড়ি তাকে যেতে হচ্ছে এবং কষ্ট করেই বাড়িও ফিরছে। হুঁ, এমন কি রাত একটা বেজে গেলেও—তা-ও দু' একদিন হয়েছে, ঠিক বাড়ি ফিরে এসেছে রমলা। কোথাও রাত্রিবাস করে নি।

কেবল তাই না। হীরেনের দুটো ঘর। দুটোই শোবার ঘর। কিন্তু বুদ্ধিমতী রমলা আলাদা ঘরেও কোনদিন শুত না। হীরেনের সঙ্গে এক ঘরেই শুত। তবে আলাদা দুটো বিছানা।

তাই তো, বুদ্ধিমতী বলেই রমলা জিতে গেছে, হীরেন বার বার হেরে গিয়ে মার খেয়েছে।

তা না হলে হীরেন যখন বুঝত, স্বামী হয়ে রমলার শরীরের গোপন ও প্রকাশ্য সব অংশ যেমন তার দেখা হয়ে গেছে, তেমনি রমলার আর্টিস্ট গুরুরা বন্ধুরা যে রমলার চুল চোখ চিবুক কি পায়ের রক্তাভ গোড়ালী নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে, তা না, তাদের সকলেরই

রমলার সব কিছু দেখা হয়ে গিয়েছিল, যে জন্য রমলার সবটা শরীরের ওপরই তাদের মায়া পড়ে গিয়েছিল, যে জন্য রমলাকে নিয়ে এত টানাটানি, একটা সন্ধ্যার অদর্শনে তারা অস্থির উন্মাদ হয়ে বার বার টেলিফোন করে মিঃ সান্যাল অর্থাৎ রমলার স্বামীকেও উত্যক্ত করে তুলতে দ্বিধা করত না। দ্বিধা করত না এই কারণে, তারা বুঝে গিয়েছিল, তারা জেনে গিয়েছিল, মিঃ সান্যাল এখন তৃতীয় পুরুষ হয়ে অশোক মিত্তির লেনের প্রচণ্ড মশার কামড় সহ্য করে রাত জেগে রমলার ঘর-দোর পাহারা দিচ্ছে এবং টেলিফোন আগলাচ্ছে।

হুঁ, এত সব বোঝার পরেও হীরেন যখন কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে মৃদু মৃদু হাসত এবং তখন আর আস্ফালন না, উত্তেজনা না, দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি না, প্রায় বরফ চাপানো ঠাণ্ডা মাথায় চুপচাপ বসে চিন্তা করত রমলার খাওয়ার সঙ্গে একদিন মারাত্মক কোন বিষ মিশিয়ে রাখবে, নয়তো একটা ধারালো ছুরি জোগাড় করে ঘুমন্ত রমলার বুকে আমূল বসিয়ে দেবে, অথবা কড়া অ্যাসিড ঢেলে রমলার অনবদ্য নাক চোখের সঙ্গে তার বিখ্যাত শরীরটাও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, রমলা ঠিক সেদিনও—হীরেনের এতসব গোপনীয় ভয়ংকর সব চিন্তার মুহূর্তেও রাত দুপুরে চটির চটাশ চটাশ শব্দ করে দোতালার সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুকে নিজের হাতে আলো জ্বেলেছে, হীরেনের চোখের সামনে পরণের দলামোচা হয়ে যাওয়া কুঁচকে যাওয়া শাড়ি ব্লাউজ টেনে টেনে খুলেছে, তারপর কেবল শায়া ও ব্রেসিয়ার পরে আলনা থেকে ধোয়া শাড়ি জামা টেনে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাথরুমে ঢুকেছে, বাথরুম থেকে ফিরে এসে এক টেবিলে হীরেনের পাশে বসে খেয়েছে। কেননা হীরেন তখনও চুপ করে বসে আছে, অপেক্ষা করছে। যেন বিনিময়ে একটু সম্মান জানাতে বুদ্ধিমতী রমলা স্বামীর সঙ্গে বসে খেত। একত্র বসে খেত এবং খাওয়াদাওয়ার পর এক ঘরে আলো নিবিয়ে

হীরেনের খাটের পাশে আলাদা খাটের বিছানায় শুয়ে পড়ত।

কারণ রমলা বুঝে গিয়েছিল, হীরেন কোনদিনই তার খাওয়ার সঙ্গে বিষ মেশাবে না, বরং রমলার ঘরে না ফেরা পর্যন্ত না খেয়ে সে অপেক্ষা করবে, যাতে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বসে খেতে পারে এবং শুতে পারে। রমলার পাতে একটা পিঁপড়ে উঠেছে কি মাছি বসেছে কি চুল পড়েছে দেখলে হীরেন যাতে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হাত বাড়িয়ে সেটা সরিয়ে দিতে পারে।

তেমনি হীরেনের বুদ্ধিমতী স্ত্রী বুঝে গিয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়লে তার গায়ে হীরেন কোনদিনই অ্যাসিড ঢালতে পারবে না বা বুকে ছুরিও বসাবে না, বরং স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে না পারার অভিমান নিয়ে পাশের ঘরে না শুয়ে রমলার খাটের পাশেই আলাদা বিছানায় শুয়ে সে তৃপ্তি পায়, কেবল তাই না রমলার বিছানায় মশারী সরে গেলে পাছে মশার কামড়ে স্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়, হীরেন তাড়াতাড়ি উঠে রমলার মশারীর ধার-টারগুলো আবার ভাল করে গুঁজে দেয়—বা হঠাৎ গরম লেগে ঘুমের ঘোরে রমলা ছটফট করছে টের পেলে হীরেন তাড়াতাড়ি উঠে পাখা খুলে দেয়।

এভাবে রমলা সারাজীবন জিতে গেছে, আর হীরেন মার খেয়েছে। কাপুরুষ দুর্বল নির্বোধ অসহায় স্বামী যেমন পড়ে পড়ে মার খায়।

কিন্তু আজ?

৪

তাই ক'দিন থেকে হীরেন ভাবছিল, আজ সে আর সেই কাপুরুষ হীরেন না, নির্বোধও নয়, অনেক বুদ্ধিটুদ্ধি তার মাথায় এখন খেলছে, এমন কি একটা চমৎকার অস্ত্র পর্যন্ত তার হাতে এসে গেছে। সাহসও বেড়েছে অনেক।

কিন্তু এসব কাজে লাগাতে পারছে কই। উল্লাসী অন্য মেয়ে। রমলা না।

আহা, যদি উল্লাসী চটুলা হত, উচ্ছৃঙ্খল হত, ভিতরে পাঁচরকম দুষ্ট বুদ্ধি নিয়ে এই জগতে কেবল নিজের সুখ খুঁজে বেড়াত!

বলতে কি, হীরেন যেন ক্রমে হতাশ হয়ে উঠছিল। আবার একটা বিষাদের মেঘ তার বুকের ভিতর জমা হচ্ছিল। যেন ভাবছিল, এখানকার ঘরবাড়ি জমিজমা ছেড়েছুড়ে বৈরাগী হয়ে সে আবার কোথাও চলে যাবে, যেমন একদিন মনের দুঃখে অশোক

মিত্তির লেনের বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে এখানে চলে এসেছিল।

অবশ্য সেটা ছিল তার ভাড়াটে বাড়ি, আসবার আগে বাড়িওলার হাতে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিল। কোন হাঙ্গামা ছিল না।

এখানে সবই তার নিজের পয়সায় তৈরি, নিজের পয়সায় কেনা।

যাবার আগে এই ঘর দুয়ার বাগান পুকুর ক্ষেত খামারের কি ব্যবস্থা করবে সেই চিন্তাও তাকে কম বিব্রত করছিল কি ?

এদিকে হুলাটাকে যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। অতিরিক্ত বেড়ে গেছে, রাতদিন বড় বেশি লাফালাফি দাপাদাপি করছে ছোঁড়া। একটু দুষ্টুমী করছিল বলে সেদিন কিনা তার এমন চমৎকার দুধালো গাইটাকে হুলা ছুরি দিয়ে মারতে গিয়েছিল। ছুটে গিয়ে হীরেন তার হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। ক'দিন আর হুলাকে ছুরি ধরতে দেয়নি। তালাচাবি দিয়ে হীরেন সেটা বাক্সে আটকে রেখেছিল। যেমন আর একদিন বাগানে লিচুগাছ কাটতে গিয়েছিল বলে হীরেন বিরক্ত হয়ে কুড়ুল কাটারি লুকিয়ে রেখেছিল দিনকতক। হুলা সে সব ব্যবহার করতে পারেনি।

এই জন্য ছোঁড়া খুবই মন খারাপ করেছিল।

কিন্তু হীরেনের মন যে আরো বেশি খারাপ হচ্ছিল উল্লাসীর ছেলেকে দেখে।

তাই তো, এমন একটা ষণ্ডাগণ্ডা তৈরি করতে গেল কেন সে ঐ ফুটফুটে কিশোরকে। কি লাভ হল !

ফুরফুরে মিহি বাতাস বইছে, পাখি ডাকছে, ঝকঝক করছে রোদ, খরগোসের মতো ভীরু সরল মন নিয়ে উল্লাসী ঘরের কাজ করছে, বন থেকে ফুল তুলে এনে ঠাকুরের পূজা করছে—এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ যেখানে, একটা শিশুকে নিজের মনগড়া একটা ছাঁচে ফেলে কঠিন পাষাণ করে তোলার কি অর্থ থাকতে

পারে হীরেন ভেবে পাচ্ছিল না।

হুঁ, হুলা তার সৃষ্টি। অপসৃষ্টি বলা যায়। হুলার দিকে তাকাতে হীরেনের লজ্জা করছিল, অনুশোচনাও কম হচ্ছিল না।

কাজেই সব ছেড়েটেড়ে এখান থেকে পালাবার কথা সে চিন্তা করছিল।

এখানে এসে সে মার খেল অন্যভাবে, হেরে গেল অন্য কারণে।

অশোক মিত্তির লেনের কুটিলতা বিশ্বাসঘাতকতা নিষ্ঠুরতার কাছে না, এবার মার খেল সরলতার কাছে। পবিত্রতার কাছে, স্নেহ মমতা ও মাতৃত্বের সৌন্দর্যের কাছে। হুলার মা'র চোখের দিকে তাকাতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

উল্লাসীর সব আশা ভরসা নির্মূল করে দিয়ে হুলাকে এমন অপদার্থ গুণ্ডা তৈরি করে তোলার অধিকার তার ছিল কি!

আজ শনিবার। সাতদিন আগেও অর্থাৎ আর এক শনিবার রাত পর্যন্ত ভাবনাটা তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। রাত্রে শুতে গেলে কথাটা মনে হত, ফলে ভাল ঘুম হত না। ঘুম হত না— যেন মুখে খাওয়াও ভাল রুচত না। কোন কাজেও মন বসত না। একটা নৈরাশ্য, কেমন একটা বিষণ্ণতার মধ্যে দিনগুলি কাটছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, পরদিন—অর্থাৎ রবিবারটা বাদ দিয়ে, সোমবার দুপুরের পর থেকে, স্বরূপনগর থেকে ফিরে এসে, না যেন স্বরূপনগর থাকতেই, সেই যে ল্যাণ্ড-রেজিস্ট্রেশন অফিসের পাশে প্রকাণ্ড বাদামগাছটার নিচে একটা নতুন চায়ের দোকান হয়েছে, ওখানে বসে চা খেতে খেতে হীরেনের মনের অবস্থা আবার চমৎকার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

অর্থাৎ রসুলপুর আসার পর থেকে এই দু'বছর যে মন নিয়ে, যে আনন্দ উত্তেজনা উৎসাহ নিয়ে সে চলছিল, আপনা থেকে তার

বুকের মধ্যে, রক্তের মধ্যে সেগুলি আবার খেলা করে উঠল, হতাশার ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

খুব ফুর্তি লাগছিল তার।

হাতল-ভাঙা কাপ, কেরাসিন কাঠের টেবিল, মাছি ভনভন করছিল, কিন্তু তা হলেও স্বরূপনগরের ঐ চায়ের দোকানে বসে তেতো চা গিলতে গিলতে হীরেনের মনে হচ্ছিল কলকাতার বনেদীপাড়ার সেই বিখ্যাত "রয়্যাল কাফেটেরিয়া'য় বসে গরম পেস্ট্রি সহযোগে আরাম করে সে কফি খাচ্ছে। কফি খাচ্ছে আর ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

হুলা সঙ্গে ছিল। এই ছ'মাসের মধ্যে স্বরূপনগর যাওয়া হয়নি। দরকার পড়েনি। সোমবার একটা জমি রেজিস্টারি করার ব্যাপারে হুলাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে হয়েছিল। হুলাকে হীরেন সঙ্গে নিয়েছিল, কিছু কেনাকাটা ছিল বলে।

নগর বলতে নগর, শহর বলতে শহর, এমন কি রাজধানী বলতেও ঐ স্বরূপনগরই এই তল্লাটের একমাত্র আশা ভরসা। এদিকে রসুলপুর, কল্যাণপুর, ওদিকে গফুরগাঁও সোনাখালী, কমলপুর—ধানখেত পাটখেত, অগুনতি ঝোপঝাড় ও নালাখাল নিয়ে চারদিকে সব ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে জাকিয়ে বসেছে স্বরূপনগর। জমি রেজিস্টারি করতে ওখানে যেতে হয়, থানায় ডাইরী লেখাতে হলে স্বরূপনগর, তেমনি একটা হাসপাতাল হয়েছে, একটা হাইস্কুল হয়েছে, সকালে মেয়েরা পড়ে, দুপুরে ছেলেদের ক্লাস বসে। হালে দু'একজন পাশ করা ডাক্তারও ডিস্‌পেনসারী খুলে বসেছে, ওখানে বি-ডি-ও অফিস। ভাল একটা জামার ছিট কিনতে হলে, কি একটা ছাতা বা এক জোড়া জুতো কিনতে স্বরূপনগরই ছুটতে হবে। রসুলপুর থেকে তিন মাইলের রাস্তা, আরো কম, ফাল্গুন চৈত্র মাসে মাঠের জল শুকিয়ে গেলে কোণাকুনি

পাড়ি দিলে মনে হয় দেড় দু'মাইলের পথ।

প্রায় ছ' মাস পর হঠাৎ সেদিন স্বরূপনগর গিয়ে হীরেনের ভাল লাগছিল। যেন এই জন্যই যাওয়া। মনটা ক'দিন থেকে ভাল ছিল না। তা না হলে জমি রেজিস্টারি করার ব্যাপারটা তেমন কিছু না, দু' চারদিন পরে গেলেও ক্ষতি ছিল না, হাতে সময় ছিল, কেনাকাটাও তেমন কিছু না—একটা গামছা, একটা তেল আর গায়ে মাখার সাবান- এসব দশদিন পরে কিনলেও ক্ষতি ছিল না, ঘরে যেগুলি ছিল কাজ চলে যেত—তা ছাড়া ভিতরে একটা অশান্তি বয়ে বেড়াচ্ছিল বলে তেল সাবানের দিকেও হীরেনের তেমন একটা মনোযোগ ছিল না। ক'দিন ধরে মাথায় তেল না মেখে, গায়ে সাবান না দিয়েই দিব্যি স্নানের কাজটা সে সেরে ফেলতে পারছিল। একটুও অসুবিধা বোধ করছিল না।

কাজেই অনেকটা যেন বেড়াতে যাবার মন নিয়ে, যদি সেখানকার রাস্তাঘাটের শহুরে চেহারা—দোকান-পাট গাড়ি-ঘোড়া দু'চারটে নতুন মানুষের মুখ দেখে মনটার একটু পরিবর্তন হয়, সোমবার বেলা দশটা বাজতেই স্নান খাওয়া সেরে হীরেন মাঠের কোণাকুনি স্বরূপনগরের রাস্তা ধরল।

হুলার একটা গেঞ্জি কিনতে হয়, তাই তাকেও সঙ্গে নেওয়া। পূজোর সময় যে গেঞ্জিটা কিনে দেওয়া হয়েছিল সেটা এর মধ্যে ছিঁড়ে ফালা ফালা করেছে ছোঁড়া। তা তো হবেই, যেমন দিন দিন তাগড়া হচ্ছে, কাঁধের মাংস বুকের মাংস এখন যেন আর জামাটামার মধ্যে আটকে রাখা যাচ্ছে না, ঠেলা মেরে জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

গেঞ্জিটা ছিঁড়ে যাবার পর উদোম গা হয়ে কদিন ঘুরছিল ছোঁড়া, এত খারাপ লাগছিল হীরেনের, যেন আরো বেশি গুণ্ডা গুণ্ডা দেখাত হুলাকে। হীরেনের মনে হত একটা বুনো মোষ তার চোখের

সামনে ঘোরাফেরা করছে। এক এক সময় হীরেন চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

রেজিস্টারি অফিসের কাজ আর কতক্ষণ। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হীরেন কাজ সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

প্রথমটা সে ভেবেছিল একটা ডাব খাবে। খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

কিন্তু রাস্তার ওপারে পুরোনো বাদাম গাছটার নিচে, আগে যেখানটায় ক'টা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে এবার হীরেন দেখতে পেল কারা চমৎকার চায়ের দোকান খুলে বসেছে।

টিনের চাল, কাঠের ফ্রেম, দরজা জানালা বেশ রং করা। পর্দাটর্দাও খুব লাগানো হয়েছে। দরজার মাথায় জমকালো সাইনবোর্ড বসানো হয়েছে। নামটাও দিয়েছে খুব। হালকা নীল জমির ওপর কালো মোটা মোটা হরফে লেখা 'অলকা কেবিন', পথচারীদের রীতিমত হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, ভিতরে জোর গ্রামোফোন রেকর্ড বাজছে তখন।

একটু চা খাওয়া যাক, কি বলিস ?

হুলা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

কিন্তু যেমন জংলী চেহারা হয়েছে এখন তোর, হীরেন নিচু গলায় বলল, তোকে নিয়ে এমন চমৎকার সাজানো গোছানো একটা দোকানে ঢুকতে আমার লজ্জা করবে যে।

হুলা রাগ করেনি। কোদালের মতো বড় বড় দাঁত বের করে হাসছিল।

ঐ ওপরেই যত রং চং, বাইরেই যত জেল্লা—আসলে রেবতী শালা তেতো চা খাওয়ায়।

অ, তাহলে তুই এখানে বসে চা খেয়ে গেছিস। হীরেন খুব

একটা অবাক হল না। কেননা এটা ওটা কিনতে হুলাকেই স্বরূপনগর পাঠানো হয়। রৌদ্রে গরমে এতটা রাস্তা হেঁটে হীরেনের বড় একটা আসা হয় না। এই ক' মাস তো সে একেবারেই আসেনি। কার দোকান বললি ?

রেবতী হুলা বলল, সাইকেল রিকশার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চায়ের দোকান করেছে।

এবার হীরেন অবাক হয়ে হুলার চোখ দুটো দেখল।

তা হলে স্বরূপনগরে এখন আর সাইকেল রিকশা চলছে না ? হীরেন ভেবেছিল ফেরার সময় একটা রিকশা ভাড়া করবে। রসুলপুরে রিকশা পাওয়া যায় না। তাই এখানে আসবার সময় হাঁটা ছাড়া উপায় থাকে না।

রিকশা নেই মানে ? হুলা আঙুল তুলে দূরের একটা বটগাছ দেখাল। ওধারে রাস্তার পাশে লাল টুকটুকে একটা নতুন লেটার বক্স বসানো হয়েছে। পাশেই দু'চারটে, না, প্রায় এক ডজন চকচকে ঝকঝকে সাইকেল রিকশা সার দিয়ে দাঁড়ানো।

দেখে হীরেন খুশি হল।

বাঃ কদিনেই জায়গাটার খুবই উন্নতি হয়েছে দেখছি। অনেক রিকশা এসে গেছে।

এখন ক্ষেত্র সা রিকশার ব্যবসা করছে। রেবতী সুবিধে করতে পারেনি। তাই চায়ের দোকান খুলে বসেছে। হুলা হি-হি করে হাসছিল।

হীরেন লক্ষ্য করছিল, তার তালিম পেয়ে গাঁয়ে থেকে ছোঁড়া কেবল গোঁয়ারতুমি শেখেনি, যেন এই -দেড় দু'বছরে বেশ চালাক-চতুরও হয়েছে, চলায় বলায় রীতিমত একটা সেয়ানা ভাব এসে গেছে, রসুলপুরে যেটা ভাল বোঝা যাচ্ছিল না, শহর বন্দরের মতো একটা জায়গায় এসে জিনিসটা পরিষ্কার ফুটে উঠছিল।

তুই দেখছি অনেক খবরই রাখিস। বিড়বিড় করে হীরেন বলল।

কথা না বলে বেশ একটা গর্বের ভঙ্গি নিয়ে হুলা হীরেনের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছিল।

উল্লাসীর ছেলে ষোল বছর বয়সেই হীরেনের মাথা ছাড়িয়ে গেল, হীরেন তা-ও দেখছিল।

অলকা কেবিনের ভিতরে ঢুকে হীরেন খুশি হতে পারল না ঠিকই। তেমন একটা ভিড়ও ছিল না। এই টেবিলে সেই টেবিলে ছাড়া ছাড়া হয়ে বসে দু'চারটে মানুষ চা খাচ্ছিল, বিড়ি ফুঁকছিল। হাতল ভাঙা পিঠ ভাঙা খান কয়েক চেয়ার ও ক'টা কেরাসিন কাঠের টেবিল দু'সারি করে বিছানো। হীরেনের হাসি পেল, টেবিলে ঢাকনা দেবার কোন দরকার ছিল না, অগুনতি মাছি বসে সেগুলি কালো হয়ে আছে।

যেন চা না খেয়ে তখনি বেরিয়ে আসতে পারলে ভাল লাগত, কিন্তু সেটা করল না হীরেন, খারাপ দেখায়, অগত্যা নাকের ডগাটা কুঁচকে একটা চেয়ার টেনে বসল এবং দু'কাপ চায়ের কথাও বলে দিল।

হুলা একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে তার চোখ।

কি হল, বোস। হীরেন ভাবল, তার সামনে সরাসরি একটা চেয়ারে বসতে হুলা সঙ্কোচ বোধ করছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভুল ভাঙল, চোখ বড় করে তার মুখের দিকে হুলা ঠোঁট টিপে হাসছে।

বড় যে হাসছিস! তার হাসি দেখে হীরেনের হাসি পেল।

হুলা আঙুল দিয়ে ভিতরের পর্দা ঘেরা পাশাপাশি দুটো খুপরি দেখাল। হীরেনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ওই পায়রার খোপ দুটো মেয়েছেলের জন্যে, ওখানে বসে তিনিরা

চা খান।

হীরেন আর হাসল না, জিনিসটা হুলার চোখে নতুন বৈকি। স্বরূপনগরের চায়ের দোকান জিনিসটাই তার কাছে নতুন।

তার ওপর মেয়েদের বসবার আলাদা কামরা, আলাদা ব্যবস্থা।

সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হুলা আবার কটমট করে চেয়ে রইল। যেন তার কৌতূহল হচ্ছিল, সত্যি ওই পর্দার আড়ালে কোন মেয়েছেলে বসে আছে কি না, বসে চা খাচ্ছে কি না।

নে, বসে পড়, চা এসে গেছে। হীরেন একটা কাপ টেনে নিল। চায়ের রং দেখেই বুঝতে পারছিল স্বাদ কেমন হবে।

কিন্তু হুলার যেন সেসব ভাববার সময় ছিল না। কোনরকম সঙ্কোচ না করে একটা চেয়ারে ঠিক বসে পড়ল এবং হাত বাড়িয়ে অভ্যস্ত মানুষের মতো একটা কাপও কাছে টেনে নিল, কিন্তু পর্দা ঝুলানো কামরা দুটোর দিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছিল না।

হীরেন ভাবল, এ-ও অস্বাভাবিক না, যেমন ছোঁড়া মাথায় লম্বা হয়েছে, ঘাড়-কাঁধে মোটা হয়েছে, গোঁফের রেখা পুরু হতে আরম্ভ করেছে। গোঁয়ারতুমি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফুটছে, তেমনি মেয়েছেলে সম্পর্কেও তার আগ্রহ কৌতূহল, অনেকটা যেন বর্ষার জলে নতুন ঘাস গজাবার মতন রাতারাতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

দাঁতে দাঁত চেপে হীরেন তেতো চা গলাধঃকরণ করল।

মাঝে মধ্যে সুন্দর সুন্দর মেয়েছেলে ওই খুপরির ভেতর বসে চা খায়।

হীরেন চমকে উঠল। কথাটা বলে হুলা তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার ঠোঁট টিপে হাসছে।

হীরেন রাগ করতে পারত, ধমক লাগাতে পারত, কিন্তু কিছুই করল না, যে অপরাধ-বোধ বিষণ্নতা ক'দিন ধরে তাকে পীড়া দিচ্ছিল,

হঠাৎ নতুন করে তার বুকের ভিতর সেগুলি মোচড় দিয়ে উঠল।

নিজের হাতে উল্লাসীর ছেলেকে সে এভাবে তৈরি করেছে।

কোনরকম ভয়-ডর লজ্জা সঙ্কোচের ধার ধারে না হুলা এখন, যেমন ফুলগাছ কাটার সময়, টেনে টেনে হাঁস মুরগির গলা ছেঁড়ার সময় কর্তাবাবুকে সে সঙ্গী পেয়েছিল, কর্তাবাবু তাকে সাহস জুগিয়েছিল, তেমনি এখন অক্লেশে কর্তাবাবুকে সুন্দর মেয়েছেলের কথাটাও শোনাতে পারল, যেন এসব আলোচনায়ও কর্তাবাবু তার সঙ্গী, তার ইয়ারদোস্ত।

খানিকটা চা খেয়ে হীরেন আর খেতে পারল না। এতটা চা নিয়ে কাপটা পড়ে রইল। মাছি বসে বসে কাপের মুখটা ক্রমশ কালো হয়ে উঠছিল।

কিন্তু হুলা তেতো চা-ই চমৎকার গিলতে পারছিল। কাপে লম্বা করে একটা চুমুক দিচ্ছিল আর হেসে হেসে বলছিল, স্বরূপনগরে এলেই আমি আগে ভাগে এখানে ঢুকে চা খেয়ে নিই। সোয়াদ নেই রেবতীর চায়ের, তেতো, তবে কি না বসে খানিকটা জিরোনো যায়, কলের গান শুনি, আর মাঝে মাঝে সাজগোজ করা খুবসুরৎ জেনানা দেখা যায়, একলা ঢুকছে, দু'জন হয়ে ঢুকছে, বেটাছেলের হাত ধরে কেউ গটগট করে ঢুকে পড়ল, তাও চোখে পড়ে, হি-হি।

তুই চুপ কর, থাম। যেন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল হীরেনের। এই বয়সের একটা ছেলের কতটা বেআদবি সহ্য করা চলে! হীরেনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, কপালের রগ দুলে উঠল।

কিন্তু এক সেকেণ্ড। তারপর হঠাৎ কোন্‌দিক থেকে যে কী হয়ে গেল, যেন কোন মন্ত্রের ফুঁ লাগল তার গায়ে, সব রাগ জল হয়ে গেল, বিষাদের মেঘ কেটে গেল, হতাশা অপরাধবোধ দুশ্চিন্তা—

যে জিনিসগুলি ক'দিন ধরে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, কর্পূরের মতন উড়ে গেল। মন শরীর হালকা হয়ে উঠল, শরীরের শিরায় শিরায় মগজের কোষে কোষে রক্তের কণাগুলি আবার চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করে দিল।

হীরেনের মনে হল, ষোল বছরের হুলার মতন হয়ে গেল সে, সেই আবেগ ও ফুর্তি নিয়ে হুলার সঙ্গে এখনি সে সুন্দর মেয়েছেলে নিয়ে গল্প জুড়ে দিতে পারে—হুলাই তো তার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু—আলোচনাটা আরম্ভ করে হুলা তো কোন অপরাধ করেনি।

মফস্বলের এমন চমৎকার পর্দা খাটানো খুপরি নিয়ে একটা চায়ের দোকান—এখানে বসে দু'জনে চা খেতে খেতে এ ধরনের রসালো গল্পই তো করবে, আর প্রাণভরে হাসবে।

দুটি ইয়ারদোস্ত যেমন হাসাহাসি করে।

তবে কি না তখনি সে হাসতে পারছিল না, হুলাও না, হুলা এবং তার চোখ এক সঙ্গে এক জায়গায় কেমন যেন আঠার মতন হঠাৎ আটকে গেছে, অন্য কোনদিকে তারা চোখ ফেরাতে পারছে না, অন্য কোন কিছুই তারা ভাবতে সময় পাচ্ছে না, প্রায় শ্বাস বন্ধ করে দু'জন, যাকে বলে কি না সেই মোহিনী মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

খুব একটা ঠাট-ঠমক ছিল না, কচিপাতা রঙের পাড় বসানো সাদা খোলের একটা শাড়ি পরনে। সাদা জুতো। হাতের প্লাস্টিকের ব্যাগটার রং সাদা। এই জন্যই যেন পর্দা সরিয়ে ওদিকের ওই একটা খুপরির ভিতর থেকে মূর্তিটি বেরিয়ে আসতে দুজনের মনে হল রেবতীর অন্ধকার অন্ধকার মাছি ভন্‌ভন্ দোকান ঘরের ভিতরটা জ্যোৎস্নার মতন সাদা কিছু একটা ঝলক লেগে খিলখিল করে হেসে উঠল।

না, খদ্দেরদের মধ্যে কেউ হাসছিল না, তেমনি হীরেনও না

হুলাও না, বরং অন্ধকার সরে গিয়ে হঠাৎ চোখের সামনে চাঁদের আলো খেলা করে উঠলে একটা আবেশ ধরা মন নিয়ে, দৃষ্টি নিয়ে সবাই যেমন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, চুপ থেকে পাতার গায়ে হোক কি গাছের গুঁড়ির কাছে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়া ধবধবে জ্যোৎস্নাটা দেখে, তেমনি সবাই তাকে, সাদা শাড়ি পরা, সাদা জুতো পায়ে সাদা রঙের ব্যাগ হাতে মেয়েছেলেটিকে দেখছিল।

বেশ টান করে খোঁপা বাঁধা। কপালটা একটু উঁচু লাগছিল। তা হলেও মুখের ঘের সুন্দর—একটা নরম ভাব, কচি সুষমা লেগে আছে ওই মুখে।

এখনো কচি রয়ে গেছে ঐ মুখ?

হীরেন অস্বস্তি বোধ করল।

চিবুকের তুলনায় নাকটি ছোট। নাকের দু'পাশে ছিদ্র দুটো কেমন যেন একটুখানি শঙ্খের প্যাঁচ নিয়ে ওপর দিকে সামান্য উঠে গেছে। ওটাই না কি ওর নাকের তথা মুখের সৌন্দর্য।

হীরেন বিশ্বাস করে না, উড়ো পাখির ডানার মতন ভুরু জোড়া তবে দোষ করল কি, হীরেনের চোখে ভুরু দুটোই ওই মুখের সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য।

আশ্চর্য, স্বরূপনগরের চায়ের দোকানে সেদিন রমলাকে দেখে হীরেন কি না হতভম্ব না হয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে রমলার নাকের ছিদ্র ভুরুর বাঁক দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

অবশ্য এক মিনিট পরেই নিজেকে সে সামলে নিল।

অন্য টেবিলের খদ্দেরদের মতন হুলা তখনো অবাক হয়ে সুন্দর মেয়েছেলেটির ছিমছাম কোমর, টান করে বাঁধা খোঁপা, শঙ্খের প্যাঁচ নিয়ে ওপর দিকে উঠে যাওয়া নাকের ছিদ্র এবং আরো যা যা দেখবার দেখছিল—দেখুক, হীরেন ভাবল, সে উনিশ বছর সমানে ওই মুখ ওই শরীর দেখেছে, এখন হঠাৎ এমন একটা লজঝড় চায়ের

দোকানে এই গরমের দুপুরে ওই মুখ ওই দেহ দেখে তার বমি আসার কথা।

বমি এল না। বরং তার পরিবর্তে সর্বাঙ্গে সুখের হিল্লোল অনুভব করল সে। মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসল, যাতে রমলার সঙ্গে সহজেই তার চোখাচোখি হয় এবং যাতে রমলা ওপাশের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে এপাশের দরজা দিয়ে বেরোয়।

যেমন সে ভেবেছিল, তাই হল, রমলার সঙ্গে চোখাচোখি হল, ওদিকের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে এধারের দরজা দিয়ে বেরোবার জন্য, অনেকটা যেন পথ খুঁজতে খুঁজতে রমলা হীরেন ও দুলার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

এক মুখ হাসি নিয়ে হীরেন তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রমলার মুখেও হাসি ফুটল।

তুমি এখানে? চিরকাল যা করত, সুন্দর দাঁতের মাড়ি বের করে রমলা ঠোঁটের কোণ দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিল।

তুমিই বা এখানে কেমন করে! যেন করমর্দন করবার ভঙ্গি নিয়ে হীরেন ডান হাতটা প্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল, তা অবশ্য করল না, হাতটা টেবিলের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল, হাতের ঝটকা খেয়ে এক ঝাঁক মাছি টেবিল ছেড়ে রমলার থুতনির সামনে হীরেনের নাকের সামনে প্রচণ্ড শব্দ করে উড়তে লাগল।

আমি তো দু' মাস হল এখানেই। রমলার চোখের পাতা আধবোজা হয়ে এল। পুরুষকে আহ্লাদ জানাবার সময় চিরকাল ও যা করে এসেছে।

হীরেন রাগ করল না। পুলক অনুভব করল। সে এখন আর স্বামী না, পরপুরুষ, তৃতীয় ব্যক্তি। সুতরাং সেই ভেবে রমলা যদি একটু আমোদ জানাবার ভঙ্গি নিয়ে ঠোঁটের কোণা ছড়িয়ে ধরে

কি চোখের পাতা বোজা বোজা করে রেখে কথা বলে তো বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় কি।

বোসো, বোসো। বরং খুশি হয়ে ব্যস্ত হয়ে হীরেন তার টেবিলের ওপাশের একটা হাতল ভাঙা চেয়ার এপাশে টেনে আনল। রমলা বসল। হীরেনও বসল।

কী মুশকিল, দু'মাস এখানে আছ—কথাটা ঠিক বোঝা গেল না, এখানে কার কাছে আছ, কী করছ, আর ক'দিন থাকবে? যেন খুশির উত্তেজনায় হীরেন রীতিমত দ্রুত শ্বাস ফেলতে লাগল।

টেবিলে একটা কনুইয়ের ভর রেখে রমলা প্রায় শব্দ করে একটু হাসল।

এখানে ব্রজমাধব বিদ্যালয়ের টিচার হয়ে এসেছি, সকালে মেয়েদের ক্লাস নিতে হয়।

চোখ দুটো গোল হয়ে গেল হীরেনের।

মেয়েদের গানবাজনার ক্লাসও ওরা খুলেছে না কি।

ধেৎ! ছোট মেয়ের মতো রমলা হেসে মাথা ঝাঁকাল। গান-বাজনা শেখাতে যাব কোন দুঃখে, ইতিহাস পড়াই।

একটু থতিয়ে গেল হীরেন। তারপর ঘাড়টা একদিকে কাত করে হাসল।

তাও বটে, তুমি তো এককালে বি, এ, পাশ করেছিলে, কিন্তু —একটু থেমে হীরেন আবার বলল, তোমার লাইন ছিল গান-বাজনার—হঠাৎ এখানে স্কুলের চাকরি?

তাতে কি, গানবাজনা করতাম বলে অন্য কাজ করব না—তার কি কথা আছে— ঈষৎ গম্ভীর হয়ে রমলা বলল, চান্স পেলাম, চলে এসেছি, অবশ্য কত দিন চাকরি ভাল লাগবে জানি না, যে ক'দিন ভাল লাগে থেকে যাব।

হীরেন চুপ করে ছিল।

তুমি? তুমি কোথায় আছ? এই স্বরূপনগরে?

হীরেন মাথা নাড়ল। রমলার চোখে চোখ রেখে বলল, দাঁড়াও আর একটু চায়ের কথা বলি।

আমি আর চা খাব না। রমলা হঠাৎ কাঁচুমাচু হয়ে অনুরোধ জানাল। হীরেন বুঝল, এতক্ষণ পর্দার আড়ালে বসে বসে রেবতীর চায়ের দোকানের অতুলনীয় চায়ের স্বাদ সে নিয়ে এসেছে, তাই আবার চায়ের নামে রমলা এমন মুষড়ে পড়েছে।

তাতে কি, গলায় শব্দ করে হীরেন হাসল, আমিও খাব, একটুখানি খাও—হুলা! যেন এবার হীরেনের মনে পড়ল, তার পাশে আর একটি মানুষ বসে আছে, হুলার দিকে সে ঘাড় ঘোরাল, আর একটু চা হবে হুলা?

কথা না বলে হুলা মাথা কাত করল। হীরেন দেখল মুহুর্মুহু ঢোক গিলছে হুলা, এক দৃষ্টে রমলাকে দেখছে।

তাই তো, কথা বলার সময় নেই ছোঁড়ার, বা চোখ তুলে হীরেনের দিকে তাকাবার। খুবই অল্প সময়ের জন্য কাছে এসেছে মেয়েছেলেটি, কাজেই যতটা পারি নাক চোখ ভুরু চুল বুক দেখে শেষ করে নিই—হুলার মনের ভাব বুঝতে পেরে হীরেন মনে মনে হাসল।

এটি কে? রমলা ঘাড় সোজা করে ধরল।

তিন কাপ চায়ের কথা বলে দিয়ে হীরেন পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘামটা মুছে ফেলল, তারপর রমলার চোখের ওপর চোখ রেখে হাসল। এটি আমার সঙ্গী, সাকরেদ, এর জোরেই তো আমি রসুলপুরে আছি। কথা শেষ করে হীরেন হো-হো করে হাসল।

রসুলপুর? রমলা ভুরু কুঁচকোল। এবং যেন আর একবার খুঁটিয়ে দেখার মতন করে হুলার মুখটা দেখল, মাথার লাল খাড়া

খাড়া চুল, তেজী গোঁফের রেখা, কাঁধ গলার পরিপুষ্ট মাংসল চেহারা, একটাও হাড় বেরিয়ে নেই এমন মজবুত চওড়া বুকের পাটা—হীরেনের মনে হচ্ছিল, সব দেখতে দেখতে রমলার জিভে জল এসে যাচ্ছে।

ছত্রিশ বছরে পা দিয়ে ষোল বছরের একটা তরতাজা জোয়ান ছেলেকে দেখতে দেখতে রীতিমত তন্ময় হয়ে যাওয়ার উৎসাহ উদ্যম তো বটেই, বলা যায় প্রতিভা, রমলার আছে, হীরেন অস্বীকার করতে পারল না।

রমলার এই তন্ময়তা দক্ষিণের বাতাস হয়ে হীরেনের গায়ে লাগল। তার এত ভাল লাগছিল।

হুঁ, রসুলপুর। আস্তে বলল সে, খুব বেশী দূর না এখান থেকে, আড়াই মাইল তিন মাইল, এখন ক্ষেতের জল শুকিয়ে গেছে, কোণাকুণি পাড়ি দিলে দেড় মাইল।

রসুলপুরের নাম শুনেছি আমি। রমলা ছোট করে নিশ্বাস ফেলল। কি করা হচ্ছে ওখানে?

বল না হুলা, কনুই দিয়ে হুলার পিঠটা একটু ঠেলে দিয়ে হীরেন বড় করে একটা হাই তুলল।

হুলা চুপ। যেন লজ্জা পেয়েছে। মাটির ডেলাটি হয়ে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কটমট করে আর রমলাকে দেখছে না।

বল, হীরেন তাকে সাহস দিল, কেমন মজা করে, দুজনে মিলে হাঁস মুরগি কেটে খাই, পুকুরের মাছ ধরে খাই, তেমনি বাগানের আম জাম লিচু, ক্ষেতের চাল, আনাজ তরকারী—তোর বৌদিকে সব শুনিয়ে দে।

বৌদি! চমকে উঠতে গিয়ে রমলা ফিক করে হাসল। বৌদি কেন? দাদা নেই তো বৌদি আসবে কোথা থেকে।

হীরেন একটুও অপ্রস্তুত হল না।

বা-রে একটা কিছু ডাকতে হবে তো, না কি মাসিটাসি ডাকবে, আমার তো মনে হয় না এখনি তোমার সেই বয়েস হয়েছে।

না না, মেঘে মেঘে বেলা কম হল কি। রমলা যেন একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল।

তাতে কি—বৌদি ডাকাই ভাল, কি বলিস হুলা। কনুই দিয়ে হুলার পিঠে আর একটা ঠেলা দিল হীরেন। দাদা সামনে নেই— আকাশে বাতাসে কোথাও মিশে আছে, কল্পনা করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। টেনে টেনে হাসছিল হীরেন।

রমলা কিন্তু হাসল না, গম্ভীর হয়ে রইল। হুলা কিছু বলছিল না। পিঠ টান করে বসে, বোঝা যাচ্ছিল, আবার মনোযোগ দিয়ে সুন্দর মানুষটিকে দেখছে।

তবু ভাল যে, দাদা মরে গেছে সরাসরি বলনি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে রমলা অত্যন্ত করুণ সুরে কথাটা বলল এবং একটা করুণ হাসি ঠোঁটের আগায় ফুটিয়ে তুলল।

এবার হীরেনকে অবাক হতে হল। রমলাকে হঠাৎ কেমন বোকা বোকা লাগছিল। অথচ এত যার বুদ্ধি, দুষ্টুমিতে যার এত মাথা, গান-বাজনায় যার এত দখল ছিল—সেই মানুষকে এমন বোকা বোকা দেখালে কার না কষ্ট হয়।

নরম গলায় হীরেন বলল, না মরে গেছে বলব কেন, আকাশে হোক বাতাসে হোক—মানুষটা যখন এখনো রয়ে গেছে—

থাক, এসব কথা এখন আর বলে লাভ নেই। চা এসে গিয়েছিল। রমলা হাত বাড়িয়ে একটা কাপ তুলে দেখে নিল। প্রসঙ্গটা নিজে থেকেই সে চেপে যাচ্ছে দেখাদেখি হীরেনও অবশ্য অখুশি হল না।

হুলা চা খাচ্ছিল। দেখাদেখি হীরেনও একটা কাপ তুলে লম্বা করে চুমুক দিল। বলতে কি, রেবতীর তেতো চায়ে এবার সে

অমৃতের স্বাদ পাচ্ছিল।

তা হলে পুকুর বাগান ক্ষেত খামার নিয়ে পুরোদস্তুর চাষী হয়ে রসুলপুরে বসে গেছ ?

একটা কিছু করতে হবে তো। হীরেন না বলে পারল না।

হীরেনের গলার স্বর তখনো নরম ছিল। ভিতরে বেদনা জাগলে মানুষ যে সুরে কথা বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে লক্ষ্য করল, চায়ের কাপ আড়াল করে চোখ দুটোকে দারুণ ছুঁচলো করে রমলা আবার হুলাকে দেখছে। ব্যাং ধরার সময় সাপের চোখ এমন ছুঁচলো জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে, তাই না ? একটা চাপা উল্লাসে হীরেনের হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়তে চাইছিল, কিন্তু তখনি ফাটতে দিল না। নতুন করে গায়ে দক্ষিণের বাতাস লাগছিল। অস্থির না হয়ে আপাতত সেটাই সে উপভোগ করল।

তুমি এবার তোমার কথা বল, গান-বাজনার চর্চাটা রেখেছ তো ? সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসল হীরেন।

রমলা মাথা নাড়ল।

সে কি ! হীরেন কপাল কুঁচকাল। ছেড়ে দিয়েছ ?

একদম।

কবে থেকে ?

কোর্ট থেকে বেরিয়ে তুমি যেদিন মুখ শুকনো করে একলা অশোক মিত্তির লেনের বাড়িতে ফিরে গেলে, আমি চলে গেলাম বালিগঞ্জে দাদার বাসায়।

তোমার মুখটাও একটু শুকনো শুকনো লাগছিল।

হবে। হাত থেকে রমলা কাপটা নামিয়ে রাখল। সেদিন সকাল থেকেই মাথাটা ধরেছিল।

দুশ্চিন্তায় ? বেহায়ার মতন হীরেন হাসল।

স্বাভাবিক। রমলা হাসল না। আগ বাড়িয়ে আমিই

ডিভোর্সের আরজি পেশ করেছিলাম, মামলায় হেরে গেলে লজ্জা অপমানটা আমারই লাগত বেশি।

তা তো বটেই, যদিও কোর্ট তোমার পক্ষেই রায় দিয়েছিল। এবার হীরেন বোকার মতন হাসল, অথবা যেন নিজেকে বোকা বোকা দেখাক, স্বরূপনগরের চায়ের দোকানে বসে সেদিন এমন একটা ভঙ্গি করল সে। তারপর, বোকা মানুষ বুদ্ধিমান মানুষকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যেন চোখে তাকায়, চোখ দুটো অবিকল হীরেন সেরকম করে তুলল। কিন্তু গানবাজনাটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়েছে!

অরুচি ধরে গেল। রমলা হাসল, কিন্তু কেউ বুঝি একটা বিস্বাদ জিনিস তার মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে তখন, চেহারাটা এমন বিকৃত করে তুলল। গানবাজনা নিয়ে ঘরে অশান্তি চলছিল, পরে যখনই কথাটা মনে হয়েছে, এই জিনিস আর ভাল লাগত না।

হীরেন চুপ করে রইল।

রমলা হাতের ঘড়ি দেখল।

এবার আমাকে উঠতে হয়।

আজ ইস্কুল ছিল না?

ফাউণ্ডেশন ডে, ছুটি।

একটু ইতস্তত করার পর হীরেন বলল, একদিন রসুলপুর এসে বেড়িয়ে যাও।

ও বাবা! গাঁয়ের নামটা শুনেছি, তা বলে রাস্তাঘাট চিনি না কি।

কিছু অসুবিধে নেই। হীরেন মাথা ঝাঁকাল। একটা রিকশাওয়ালাকে বললে আমার বাড়ির উঠোনে তোমায় পৌঁছে দেবে।

যাবার তো কোন অসুবিধাই নেই। এতক্ষণ পর হুলা মুখ

খুলল। উৎসাহে চোখ দুটো দপদপ করছিল, যেন সে চাইছিল, আজই এই মুহূর্তে সুন্দর মেয়েছেলেটি তাদের রসুলপুর বেড়াতে যাক।

তারপর? হীরেন দেখল, দুলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রমলার ছুঁচলো চোখের মণি ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলছে। তোমাদের রসুলপুরে তো রিকশা পাওয়া যাবে না, সেখান থেকে ফেরা হবে কেমন করে? প্রায় দুলার মুখের কাছে মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছিল রমলা।

তার জন্যে ভাবনা! কর্তাবাবুর গরুর গাড়ি আছে না? দুলা হীরেনের দিকে ঘাড় ফেরাল। হীরেন সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

ফেরার জন্যে ভাবনা নেই, যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আচ্ছা দেখি। রমলা উঠে দাঁড়াল। চায়ের বিল মিটিয়ে দিয়ে রমলার সঙ্গে তারাও তখন দরজার দিকে এগোচ্ছিল।

দুলার মতো হীরেনও রমলার পিঠ দেখছিল, কোমরের দোলানি দেখছিল। কিন্তু দোলানি কমে গেছে, আগে হাঁটবার সময় অনেক বেশি দুলত পিছনটা। হয়ত পাছার মাংস কমে গেছে বলে খুব বেশি এখন চোখে লাগে না, হীরেন চিন্তা করল।

আর একটা নতুন জিনিস দেখল সে। পিঠ-কাটা পেট-কাটা ব্লাউজ রমলার গায়ে নেই। রীতিমত ভব্যসভ্য জামা।

উপায় কি, হীরেন মনে মনে হাসল, আগের মতো জামা পরলে বাছামণিকে মফস্বলের স্কুলে বেশিদিন টিচারি করতে হবে না। কিন্তু এমনিও যে চাকরিটা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে, হীরেন যেন ভরসা পাচ্ছিল না।

তোমরা একদিন আমার বাসায় এস। রাস্তায় নেমে রমলা দু'জনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

কোথায় বাসা? দুলা আগে বলল।

এই তো সোজা রাস্তা। রমলা হাত দিয়ে তার বাসার রাস্তা দেখাল। হেঁটে গেলে দশ মিনিট। একটা কদম গাছ চোখে পড়বে, তারপর একটা করাত কল, করাত কল ডাইনে রেখে গলি মতন একটা ছোট রাস্তা। ওটা ধরে আর দু'পা এগিয়ে গেলেই আমার বাসা।

আমি চিনি। হুলার চোখ নেচে উঠল। করাত কলের পাশেই বিপিন কামারের দোকান, আমাদের নতুন কুড়ুলটা বিপিনের দোকান থেকেই এনেছিলাম।

হুলা হীরেনের দিকেও একবার তাকাল।

হুঁ, রমলার চোখে চোখ রেখে হীরেন হাসল। এটা ওটা কিনতে হুলাকেই স্বরূপনগর ছুটে ছুটে আসতে হয়। এখানকার পথঘাট আমার চেয়ে ওর অনেক বেশি চেনা হয়ে গেছে।

হুলার চোখের দিকে তাকিয়ে রমলা ভয়ংকর একটা মিষ্টি হাসি হাসল।

তবে তো ভালই হয়েছে, কর্তাবাবুকে নিয়ে তুমি একদিন আমার বাসায় চলে আসবে।

তার জন্যে ভাবনা নেই, কালই হয়তো ও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হবে। একটা তামাক কাটার দা কিনতে হুলাকে একবার স্বরূপনগর আসতে হতে পারে।

বেশ কাল এসে আমার বাসাটা তুমি চিনে যেও, আর একদিন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে।

এমন সরাসরি আমন্ত্রণ পেয়ে হুলা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠল।

রমলা আর অপেক্ষা করল না। বটতলার রিকশার আড্ডার দিকে হেঁটে গেল। বোঝা গেল রিকশা চড়ে ব্রজমাধব স্কুলের মাস্টারনী বাসায় ফিরবে।

৫

পরদিন হুলা ঠিক স্বরূপনগর চলে গেছে।

হীরেনই গরজ করে পাঠিয়েছে।

তামাক কাটার দা-টা কিছু না, হীরেন তামাকও খায় না, আর তার জমিতে তামাক পাতার চাষও হয় না, তা হলেও একটা জিনিস ঘরে রাখতে ক্ষতি কি। একটা অস্ত্র।

হুলাকে যেমন বুঝিয়েছে, সে তাই বুঝেছে।

তামাক কাটার দা কেন, যদি হীরেন তাকে বলত, মোষ বলি দেবার একটা খড়্গ আমরা ঘরে রাখব তো হুলা তাতেও খুশি হত, বরং আরো বেশি আহ্লাদ হত তার।

অস্ত্রের নাম শুনলেই তার ঘাড়ের রগ ফুলে ওঠে, চোখ চকচকে হয়ে ওঠে। আরো বড় কথা, আগের দিন স্বরূপনগর থেকে ঘুরে এসেছে; আবার আজ কর্তাবাবু তাকে স্বরূপনগর পাঠাচ্ছে, আনন্দে

দিশেহারা হয়ে ছোঁড়া বুঝি তখনি নাচতে সুরু করে দেয়।

আর, তা ছাড়া, সেদিন স্বরূপনগর থেকে ফিরে এসেই কাঠের বাক্সের তালা খুলে কুড়ুল কাঠারি বের করে হীরেন আবার হুলার হাতে সব তুলে দেয়। কাটুক, যত খুশি গাছ সে কাটতে চায়, যদি ফলের গাছও কাটতে চায় হুলা, হীরেন বাধা দেবে না।

গাছ কাটুক, আরো বেশি করে হাঁস মুরগির গলা ছিঁড়ুক।

গাছ কাটলে আবার গাছ গজাবে, এক ঝাঁক হাঁস মুরগি কেটে সাফ করলে দুঃখ নেই, কালই আবার ডিম দেবে, আর এক ঝাঁক বাচ্চা ফুটবে। এই নিয়ে কি না মাথা ঘামাতে আছে!

তোমায় দেখতে হবে অস্ত্রটার কেমন ধার উঠছে, এক দমে কত গাছ কত পাখি কেটেকুটে সাবাড় করতে পারছে।

তাই বলা হচ্ছিল, হুলাকে পাশে বসিয়ে সেদিন স্বরূপনগরের চায়ের দোকানে বসে তেতো চা গিলতে গিলতে হীরেনের মনে হচ্ছিল, টুপ করে গাছের ফলটি যেমন কোলে এসে পড়ে, তেমনি এতকাল পর ঈশ্বর তাকে একটা সুযোগ পাইয়ে দিল। ঈশ্বরের দয়া? অনুগ্রহ?

না কি ঈশ্বর তার সঙ্গে আবার রসিকতা করছে, কেননা আগেও দু'একবার এমন রসিকতা করেছে।

না না, রেবতী সা'র মাছি ভনভন 'অলকা কেবিন' ছিল না সেটা। রীতিমত বনেদি পাড়ার দোকান। 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কাফেটেরিয়া'—ঠিক এলগিন রোডের মোড়ে।

যদি কেউ উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করে তবে এভাবে সুরু করবে:

সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে। পশ্চিমের আবির গোলা রং দোয়াতের কালি হয়ে গেল। পূবের মাঠের ক্রিকেট ম্যাচ শেষ। হৈ-হট্টগোল থেমে গেছে। দক্ষিণের মাঠের ব্যাডমিন্টন কম্পিটিশনও কিছুক্ষণ

আগে সাঙ্গ হয়ে কলকাকলী থেমে গেল। ক্রিকেটের মাঠ ছেড়ে এক নিঃসঙ্গ যুবক নিজের মনে শিস্ দিতে একটা রাধাচূড়া গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। তাই তো, কেন জানি সে একলা থেকে গেল, দলের সঙ্গে গেল না। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছে সে?

যাকে খুঁজছিল, সে এসে গেছে। সে-ও দলছুট। তার বেণী তুলছে। হাতের র‍্যাকেট একটু একটু করে শূন্যে নাচিয়ে খড়ির দাগ বুলোনো ব্যাডমিণ্টন কোর্টের চৌকোণ ঘরগুলি আস্তে পার হয়ে একটি নির্জন নিঃশব্দ তারার মতন গাছতলার অন্ধকারে এসে যুবতী মিটিমিটি হাসতে লাগল। যুবক তার হাত ধরল।

হাত ধরাধরি করে দু'জন রাধাচূড়া গাছের অন্ধকার পার হয়ে কৃষ্ণচূড়ার বনের মাথার উপর পঞ্চমীর চাঁদের সলাজ হাসি দেখতে দেখতে আলোর দেশে শব্দের জগতে পৌঁছে গেল।

কত গাড়ি কত বাড়ি! ফুলের পাপড়ির মতো থরে থরে সাজানো রূপালি নীল নিয়নের মালা পরে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কাফেটেরিয়া' হাসছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

যুবতীর হাত ধরে যুবক সিঁড়ি ভেঙ্গে রেডিওগ্রামের বাজনার তালে তালে পা ফেলে ওপরে উঠে গেল। দু'জনের বসবার মতন অগুণতি শঙ্খ শামুক মীন মকর আঁকা পরিচ্ছন্ন ঢাকনা পরানো ছোট্ট টেবিল, পিঠ-উঁচু দুটো চেয়ার নিয়ে নিরিবিলি ব্যালকনি। পায়ের নিচে আলো বাজনা গাড়ি মানুষ। মাথার ওপর জ্বলজ্বলে তারা ছিটানো অনন্ত অন্ধকার।

যেন প্রথমদিনই আমাদের গল্পের নায়ক নায়িকা কফিখানার ছাদ-খোলা এমন সুন্দর বারান্দাটি বেছে নিয়েছিল, তাই না তাদের প্রেমের ফুল সব ক'টা পাপড়ি মেলে ধরে, সবটুকু হাসি ছড়িয়ে এত দ্রুত ফুটতে পেরেছিল, হুঁ, সুগন্ধ বিলোতে পেরেছিল।

গন্ধে গন্ধে আকুল হয়ে যুবকের বুকে যুবতী মাথা রেখেছিল,

তারপর লাল টুকটুকে দোপাটির দুটো পাপড়ি মেলে দিয়ে যুবতী ঠোঁট ফাঁক করেছিল, পরম বিশ্বাসে পরম নির্ভয়ে যুবক সেখানে মুখ রেখেছিল।

অর্থাৎ ঈশ্বরের রসিকতার কথা মনে পড়তে এলগিন রোডের কফিখানার অনবদ্য ছবিটা হীরেনের চোখের সামনে ভাসছিল। কেননা স্বরূপনগরের লজ্ঝড় চায়ের দোকানে আর একবার রসিকতা করে ঈশ্বর হুট করে রমলাকে পাঠাল। হীরেনের হাসি পাচ্ছিল, দুঃখও হচ্ছিল।

সেদিনের রসিকতা কিন্তু অন্য রকম ছিল। লাল টুকটুকে দোপাটি পাপড়ির মতন ফাঁক করে ধরা ঠোঁটের ভিতর মুখ গুঁজে রাখার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। দেখতে দেখতে প্রেমের ফুলে ফল ধরল। তাদের বিয়ে হল। আর, এটা সবাই জানে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফলটা পেকে ওঠে।

পরম বিশ্বাস নিয়ে পরম আগ্রহ নিয়ে একসঙ্গে বত্রিশটা দাঁত বাগিয়ে হীরেন সেই মধুর রসাল ফলে কামড় বসাল।

কামড় বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াক্ থুঃ, পোকা কিলবিল করছে, দুর্গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করছে। রীতিমত বেয়াকুফ বনে গিয়ে হীরেন ফলটা সরিয়ে রাখল।

অথচ কি চমৎকার দেখতে ওপরটা, কেমন খাসা গোলাপী রং চামড়ার। রসিকতা ছাড়া আর কি!

রসিকতা, চূড়ান্ত রসিকতা। তা না হলে সেদিনও রেবতীর চায়ের দোকানে হীরেন দেখল, ছত্রিশ বছর বয়সেও রমলার গায়ের চামড়া পাকা আমের মতন বাহারে, দেখলেই দাঁত বসাতে ইচ্ছে করে নখ বসাতে ইচ্ছে করে। তাই না ছুলা এমন হাঁ করে দেখছিল। ছোঁড়ার জিভে কত জল এসেছিল, তাজা হৃৎপিণ্ডটা লুকিয়ে কেমন

লাফালাফি করছিল, হীরেনের বুঝতে এক সেকেণ্ডও দেরি হয়নি।

কাজেই সেদিন থেকে হীরেনের বুকের ভিতর বাজনা বাজছে।

তার চল্লিশ বছরের পুরোনো হৃৎপিণ্ডও হরদম লাফাচ্ছে। সুযোগ এসে গেছে, অস্ত্রটা এবার কাজে লাগবে।

ঈশ্বর যদি নতুন একটা রসিকতাই করতে চায়, হীরেনও পাল্টা রসিকতা করবে।

কাটা ঘায়ে কেমন করে নুনের ছিটে দিতে হয় সে জেনে গেছে।

অনেক ঘা খেয়েছে, মার খেয়েছে সে, তারপর এই দু'বছর রসুলপুরের খোলা জলহাওয়া গায়ে লাগিয়ে মগজটা পরিষ্কার হয়েছে, বুদ্ধিটা পেকেছে।

হুঁ, পরদিনই হুলাকে তামাক কাটার দা কিনতে স্বরূপনগর পাঠানো হয়েছিল।

চমৎকার একটা দা এবং এক গাল হাসি নিয়ে হুলা সেখান থেকে ফিরে আসে।

ফিরতে রাত হয়েছিল। উল্লাসী গালে হাত দিয়ে হুলার জন্য ভাবছিল।

হীরেন অনেক করে মানুষটাকে বুঝিয়েছে, ভয় নেই, পথ ঘাট অচেনা নয় হুলার। হয়তো কোন বন্ধুর দেখা পেয়েছে, সিনেমা টিনেমা দেখতে পারে, চায়ের দোকানে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে পারে।

স্বরূপনগরে সিনেমা ঘর খোলা হয়েছে, চায়ের দোকানও থাকতে পারে।

উল্লাসী অবিশ্বাস করেনি, কিন্তু সেখানে হুলার বন্ধু জুটে গেছে—কথাটা যেন তার কাছে কেমন লাগছিল।

অর্থাৎ হুলা যে এতটা সাবালক হয়ে গেছে—বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে

শহর বন্দর জায়গায় সিনেমা দেখছে, চায়ের দোকানে বসে দিনভর আড্ডা দিচ্ছে—হুলার মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার চোখ দেখে হীরেন বুঝতে পারছিল।

কিন্তু তোমার বিশ্বাসই সব কিছু না হুলার মা, হীরেন তখন মনে মনে হেসেছিল, বেটাছেলে বন্ধু তো ভাল, সুন্দর মেয়েছেলে দেখলেও আজকাল হুলা কেমন বেসামাল হয়ে পড়ে, তুমি তা বুঝবে কেমন করে। তোমার ছেলে তোমার চোখে সব সময়ই দুধের শিশু। সব মা-ই তাদের ছেলেকে এমন ভাবে কি না।

যাই হোক, দুধের শিশুর অত্যধিক ফুর্তি দেখে হীরেন বুঝতে পেরেছিল, দুধ না—পেট ভরে হুলা অমৃত খেয়ে এসেছে। অসম্ভব সুখ্যাতি করছিল সে ব্রজমাধব স্কুলের মাস্টারনীর।

অ-নেক-ক্ষণ তাকে আটকে রেখেছিল, কিছুতেই আসতে দিতে চাইছিল না। হুলার জন্য পরোটা তৈরি করেছিল ডিম ভেজেছিল।

ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটা। যেমন ঘর দোরের ছিমছাম, সাজানো গুছানো চেহারা, তেমনি হাতের কাজ, তেমনি কথাবার্তা।

হুলার ইচ্ছা করছিল, পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার স্বরূপনগর ছুটে চলে যায়। বড় একা একা আছে, দেখে হুলার এমন কষ্ট হচ্ছিল।

যাবি যাবি—হীরেন বুঝিয়েছিল, দু'দিন একদিন পর পর এটা ওটা কিনতে ওখানে যেতে হচ্ছে, খাওয়া কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আর কি দেখলি, আর কি বলল ভাল মানুষটা তোকে।

যতক্ষণ ইস্কুল ততক্ষণ ইস্কুল। না হলে একলা সংসারের আর কাজ কি। একটু জল তোলা, একটু বাটনা বাটা, এইটুকুন একটা হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে নেওয়া, সেই সঙ্গে সামান্য ডাল তরকারী যা হোক কিছু নামিয়ে নিলেই ওদিকের কাজ শেষ। আর ঘরদোর বিছানাটাকে—একদিন ঝাড়পোঁছ করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে,

তিন দিনেও আর হাত লাগাতে হয় না, অগোছাল করবে কে, ঘরে দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই, একটা বাচ্চা থাকলেও ভয় ছিল, এখানকার জিনিস ওখানে চলে যাবে, টান করে পাতা পরিপাটি বিছানা এলোমেলো হবে। তেমনি আরসির জায়গায় আরসিটি, চিরুনির জায়গায় চিরুনিটি, চুলের ফিতা সাবান কুঁজো কাচের গ্লাশ গামছা ফুলদানী ছবির মতন সব এক জায়গায় থেকে যাচ্ছে, দেখলে কেমন হাঁপ ধরে। আর মানুষটিও যেন পাথরের মূর্তি। যখন ইস্কুল তখন ইস্কুল, তারপর একরত্তি সংসারের টুকিটাকি কাজ, বিশ মিনিটের গেরস্তালী, তারপর আর কিছু না, একটানা অবসর, একটানা হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকা।

হুলা খুঁটিয়ে সব বর্ণনা দিচ্ছিল, একদিনেই খুঁটিয়ে এত সে দেখে এসেছে, চমৎকার!

তারপর? হীরেন কান পেতে শুনছিল, যেন চোখের সামনে হাঁপ-ধরা শূন্য ঘরের মধ্যখানে, কি জানালার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের মূর্তিটা দেখছিল।

আর কেমন জায়গা, কেমন ঘর!

হুলা বলছিল, কদমগাছ পিছনে রেখে করাত কল পার হয়ে বাঁ হাতি সরু পথ ধরে দু'পা এগিয়ে গেলেই লাল টালি ছাওয়া এক ফোঁটা বাড়ি, সামনে মস্ত উঁচু পলাশ গাছ, আগুনরঙা ফুল ফুটে আকাশ লাল হয়ে আছে; তেমনি লাল টালি ছাওয়া ঘরের দরজায় টুকটুকে লাল পর্দা, চৌকাঠের সামনে চড়া লাল পাপোশ, ঘরে ঢুকেও সেই রং, লাল ফুল তোলা বাহারের টেবিল ঢাকনা, হুঁ, রক্তজবা, এক নজরে দেখেই হুলা চিনতে পেরেছিল, তেমনি বিছানার সুজনি, হুলা প্রথমটা ভয় পায়, যেন খাটের ওপর রক্তের ছিটা—তা নয়, চিকনের কাজের মতন সারা বিছানায় মাদার ফুল ছড়িয়ে।

এই পর্যন্ত বলে হীরেনের চোখে চোখ রেখে হুলা মিটিমিটি

হাসছিল।

কোন্ জঙ্গল থেকে তুলে এনেছিল কে জানে! হীরেনের কপালের রগ ফুলে উঠেছিল। যেন আচমকা রক্তের ধমক লেগে চোখ দুটোও লাল হয়ে গেল। আমাদের এদিকে মাদার জঙ্গল কেটে তুই সাফ করেছিস।

হুঁ। কিন্তু দুলা আর মিটিমিটি হাসল না, একটু যেন মুখ কালো করে ফেলল।

তারপর? আর কী দেখলি!

লাল চটি পায়ে, গায়ের জামাটাও মোরগ ফুলের রং।

দাঁতে দাঁত ঘষল হীরেন। মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, তা তো হবেই, অনেক রক্ত খেয়ে এসেছে সারাজীবন, এখন মফস্বলে এসে আবার স্বপ্ন দেখছে, লালের নেশা ভুলতে পারছে না, এখানেও গায়ে পায়ে ঘরে বাইরে লালের ছড়াছড়ি।

আর কি দেখলি? চোখ ছুঁচলো করে হীরেন দুলার মুখ দেখল।

ঐ যে বললাম, বড় একলা মানুষটি, ঘরদোর কেমন শূন্য খালি, মরুভূমির মতো, একটা বেড়াল পর্যন্ত চোখে পড়ল না, যে মঁ্যাও করে ডাকবে, একটা ইঁদুরের নড়াচড়া শুনলাম না।

দুলা লম্বা করে নিশ্বাস ফেলল, খুশি হয়ে সে ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু বুকের ভিতর একটা দুঃখ যেন পুঁটলি বেঁধে নিয়ে এসেছে।

খানিকটা চুপ থেকে, দুলা আবার বলল, মনের মধ্যে কষ্ট আছে মানুষটার, চোখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

এবার আর কষ্ট থাকবে না। হীরেন বলছিল, তোকে পেয়ে গেছে, ঘন ঘন যাওয়া আসা করবি, গল্পটল্প করবি, মরুভূমি আর মরুভূমি থাকবে না, গাছ গজাবে ফুল ফুটবে পাখিটাখি ডাকবে।'

৬

এই পর্যন্ত।

তারপর কিন্তু দু'দিন স্বরূপনগরের কোন কথাই তুলল না হীরেন।

হুলা উসখুস করছিল।

হীরেন তাকে কাটারিটা সান দিতে বলে, হুলার যেন সেদিকে মন নেই। কাটারি হাতে নিয়ে আকাশ দেখে ছোঁড়া, আর বড় বড় নিশ্বাস ফেলে।

হীরেন পুরনো ভাঙা কুড়ুলটার নতুন বাঁট লাগাতে বলে, কুড়ুল হাতে নিয়ে হুলা চুপ করে বসে থাকে। কুড়ুলের দিকে মন থাকে না।

হীরেন মনে মনে হাসে।

একদিন আলাপ করে এসেই এমন বিরহ জ্বালা!

কিন্তু এমন হলে তো চলবে না চাঁদ।

হীরেনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। তবে আর গড়েপিটে তোমায় তৈরি করলাম কী। রসুলপুরের অনেক ফুলগাছ কেটেছ তুমি, অনেক হাঁস মুরগির গলা ছিঁড়েছ, তোমার অনেক ধার, অনেক বিক্রম। এবার স্বরূপনগরের পালা। লাল টালির বাড়ির সামনের পলাশ গাছটা কুপিয়ে কাটবে, দরজার টুকটুকে লাল পর্দাটা ছিঁড়ে ফালাফালা করবে, মাদার ফুল ছিটানো বিছানায় কাদা লেপে দেবে, তারপর লাল ব্লাউজ পরা শরীরটার ওপর থুথু ছিটিয়ে মাথা উঁচু করে ফিরে আসবে, তবে তো আমার উপযুক্ত শিষ্য, আমার বন্ধু, আমার মনের মতন হাতিয়ার। আর তা না হয়ে একটু আদর পেয়ে মিষ্টি হাসি দেখে ডিম পরোটা খেয়ে হাত-পা গুটিয়ে যদি ভোঁতা মেরে বসে পড় তো মুশকিলের কথা। এমনটা আমি হতে দেব কেন, তবে আর দু' বছর এত চেষ্টা এত মেহনৎ কেন!

হীরেন হাল ছাড়ল না।

দু'দিন হুলাকে দিয়ে অনেক কাজ করাল। কর্তাবাবুর ধমক খেয়ে হুলা কাটারির শান তুলল, কুড়ুলেরও বাঁট পরাল, এই গাছ কাটল, সেই গাছ কাটল এবং কম করেও আধ ডজন হাঁস মুরগি পায়রা বধ করল।

ধমক খেয়ে এবং ক্রমাগত কুড়ুল কাটারি ছুরি চালিয়ে হুলার মেজাজ আবার ফিরে এল। বুকের পেশী নাচতে লাগল, চোখে রক্তের ছিটে দেখা দিল, আবার হৈ-হৈ ছুটোছুটি, রাস্তার দুটো নেড়িকুত্তার মাথা ফাটিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরাল, এমনি, কুকুর দুটো কাঁইকুঁই করতে করতে রাস্তার ধারের নালার ভিতর ছিটকে পড়ে এক সময় মরে শক্ত হয়ে রইল, আরম্ভ হল-কাক শকুনের নাচানাচি, আকাশ ফাটানো চিৎকার।

দেখে হুলা দু' হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে সুরু করে দিল।

হীরেন মনে মনে বলল, সাবাস!

কিন্তু হুলা এখানে থামবে কেন।

আরো কিছু কাটতে চাইছে, মারতে চাইছে, আরো রক্তপাত ঘটাতে পারলে তার তৃপ্তি।

তখন দুপুর, চৈত্রের গনগনে রোদে আকাশ মাটি আগুন হয়ে উঠেছে, তার ওপর এলোমেলো দমকা হাওয়ায় প্রচুর ধুলো উড়ছে, শুকনো পাতার ঘূর্ণি নেচে নেচে ফিরছে, যেন তাজা রক্ত ঝরাবার, একটা বড় রকম খুনখারাবি ঘটাবার উপযুক্ত সময়।

তামাক কাটার দা-টা দিয়ে কিন্তু কোন কাজ হল না। বলতে বলতে এক সময় হুলা ঝড়ের মতো ছুটে এল।

তাই তো! হীরেন চোখ তুলল। হলদে দাঁত ছড়িয়ে হুলা হাসছে। গায়ে মাথায় ধুলো। একটা কাঠবিড়াল ধরে এনেছে জঙ্গল থেকে।

ওটা দিয়ে কী হবে! অবাক হতে গিয়ে হীরেন হাসল।

হুঁ, ওটার দরকার, তামাক পাতা এই মুলুকে নেই, তা বলে অস্তরটার কেমন ধার পরখ করব না! কষ্ট করে কিনে আনলাম।

তা বটে! হীরেন এবার আঁচ করতে পারল হঠাৎ তামাক-কাটা দায়ের খোঁজ কেন।

তখনি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে অস্ত্রটা বের করে আনল। ছোট-খাট জিনিস, চকচকে নতুন বাঁট, ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা।

তামাক পাতা কেন, হুলার হাতে দা-টা তুলে দিয়ে হীরেন চোখ টিপল, মানুষের গলা কাটা যাবে খুব—ছাখ কেমন ধার।

হুঁ, কাটতে কাটতে আরো ধার উঠবে।

দা নিয়ে হুলা উঠোনে নেমে গেল।

হীরেন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল।

এক কোপে হুলা কাঠবিড়ালের গলা আলগা করল, তারপর

লেজের দিক কাটল, তারপর পেট, ফিনিক দিয়ে রক্ত তার কপালে ছিটকে পড়ল, দুটো হাত রক্তে লাল, চমৎকার দৃশ্য। মাথায় উসকোখুসকো লাল চুল, চোখ দুটো পেঁয়াজের মতো গোল হয়ে গেছে, লাল হয়ে গেছে, কপালে রক্ত, হাতে রক্ত নিয়ে ঘনঘন শ্বাস ফেলছে হুলা, তার চওড়া বুক উঠছে নামছে, কাঁধের পেশীতে ঢেউয়ের খেলা চলেছে, এইটুকুন একটা জীব, সামান্য কাঠবিড়াল বধ করাটা কিছু না, কিন্তু বধ করার উত্তেজনাটা দেখবার মতন, উল্লাসটা উপভোগ করার মতন।

হীরেনের চোখের পলক পড়ছিল না। দাওয়া ছেড়ে সে-ও উঠোনে নেমে গেল।

রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঘা ছুটে এসেছে। এ বাড়ির পোষা কুকুর লেজ নাড়ছে, লাল জিভ বেয়ে টসটস রস ঝরছে, এবার কাঠবিড়ালের পেটটা পুঁচিয়ে ক'টুকরো করল হুলা, তারপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাঘার সামনে ফেলে দিল, তাজা মাংস পেয়ে বাঘা গপগপ গিলছে, নরম হাড়, খুব একটা চিবোতে হয় না, মৃদু কুড়মুড় শব্দ হচ্ছে বাঘার মুখের ভিতর, মাংস শেষ করে চকচকে চোখ করে বাঘা উঠোনের রক্ত চাটছে, এবার চমৎকার চপচপ শব্দ।

হুলার মাথার কাছে মাছি উড়ছিল, সেই কদামর ডালে, উল্লাসীর ঘরের চালের ওপর রাজ্যের কাক এসে উড়ে বসে চিৎকার করছে —যেন চৈত্রের গরম দুপুরের একটা মহোৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, বিনিয়ে বিনিয়ে পাতার ঘরে বসে একজন কাঁদছিল। উল্লাসী।

কান্না শুনে হুলা হি-হি করে হাসছিল।

কি হল হুলা। হীরেনও হাসছিল।

মা বেটি কাঁদছে, হুলা শুকনো পাতা টেনে এনে হাতের অস্ত্র রগড়ে রগড়ে সাফ করছে, রক্ত মুছছে। কাল থেকে নতুন করে

বেটি কান্নাকাটি সুরু করেছে; হুঁ, আমি নাকি ডাকু জহ্লাদ—বলছে, আমি নিঘ্যাত একদিন মানুষের গলা কাটব।

কথা শেষ করে হুলা হো-হো করে হাসল। হীরেনও শব্দ করে হাসল।

তাই তো, কাল থেকে নতুন করে হুলা কাটাকাটি আরম্ভ করেছে, হাঁস মুরগি পায়রা নেড়িকুত্তা কাঠবিড়াল—হাতের কাছে যা পাচ্ছে, মিইয়ে গিয়েছিল ছোঁড়া, স্বরূপনগর থেকে ঘুরে এসে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, স্বরূপনগর থেকে লাল পলাশের নেশার মতন টুকটুকে লাল চটি লাল ব্লাউজ পরিপাটি লাল বিছানা—অনেক কিছুর নেশা নিয়ে ফিরে এসে ঝিমিয়ে পড়েছিল। ধমক দিয়ে চোখ রাঙিয়ে হীরেন ছোঁড়াকে আবার গরম করে তুলেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে তাকে বোঝাতেও হয়েছে বিস্তর, পাখি পড়ানোর মতন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথাই বার বার কানে দিয়েছে।

মেয়েমানুষের আদর সোহাগ কিছু না, দু'দিন ভাল লাগে, তারপর আর ভাল লাগে না, তেমনি সুন্দর মুখের মিষ্টি হাসি দু'দিন ভাল লাগে, তারপর পুরোনো হয়ে যায়। তা না হয়, আর একদিন স্বরূপনগর বেড়াতে যাবি, গল্প করে আসবি, কিন্তু তা বলে আমরা আমাদের খেলা বন্ধ রাখব কেন, আমরা যেমন আমোদ-ফূর্তি করছিলাম, চালিয়ে যাব—এ জিনিস বন্ধ করার কোন মানে হয় না।

হুঁ, খেলা, ফুল গাছ কাটা হাঁস মুরগি পায়রা ধরে ধরে সাবাড় করা—প্রথম দিন থেকে হুলাকে তাই বলে এসেছে বুঝিয়ে এসেছে সে, বৈরাগী হয়ে ঘরে বসে থেকে দা কুড়ুল কাটারি ছোরায় জং ধরাবার কোন মানে হয় না।

এখন উল্লাসীর কান্নার কথায় হীরেনকে আবার মুখ বেঁকিয়ে হাসতে হল।

মেয়েছেলের কান্না কিছু না, শুনলে দু'দিন মন খারাপ হয়, তারপর পুরোনো হয়ে যায়, একঘেয়ে লাগে। তোর মা প্রথম থেকে কাঁদাকাটা করছে, সেই অতসী গাছ কাটার দিন থেকে কান্না শুনে আমরা যদি খেলাধূলা বন্ধ রাখতাম তবেই হয়েছিল আর কি, তাই না?

একশবার। হুলা মাথা ঝাঁকিয়েছে। ওই বেটির কান্না বড় এলটা গেরাহ্যি করি কি না আমি, হুঁ।

শুনে হীরেন খুশি হয়েছে।

কান্নার ব্যাপারটা বোঝাতে তাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। মেয়েমানুষের কান্না খানিকটা নোনা জল ছাড়া আর কিছু না, হুলা প্রথম থেকে বুঝে এসেছে।

কিন্তু ঐ হাসির ব্যাপারটা, মেয়েমানুষের মিষ্টি হাসিও যে একদিন জলো পানসে—জলো পানসে তো ভাল, তেতো মনে হবে, বিষের মতন লাগে, কথাটা বুঝতে হুলার দেরি হয়েছিল, পুরো দুটো দিন লেগেছিল। এখন বুঝে গেছে। এখন আর চিন্তা নেই। আবার সেই আগের হুলা। হীরেনের হাতের ঝকঝকে খড়্গা।

দরকার হলে মানুষ কাটতে হয় বৈকি। হীরেন দাওয়ায় উঠে গেল। তামাক কাটা দা-টা কর্তাবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হুলা উঠোনে বাঘার সঙ্গে খেলা করছিল।

বুঝলি—দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হীরেনের রীতিমত চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, অর্থাৎ পাতার ঘরে উল্লাসীর কানেও যাতে কথাটা ঢোকে, সংসারে সবাই সৎ না নিষ্পাপ না সুন্দর না—ওপরটা সুন্দর, কিন্তু ভিতরটা সাপের বিষ, অন্ধকার পাপের রাজ্য, এমন মানুষ চোখে পড়লে, বেটাছেলে হোক মেয়েছেলে হোক—গলা কাটতে হয়, হাতের কাছে অস্ত্র না থাকলে পায়রা মুরগির মতন টেনে টেনে গলা আলগা করতে হয়। তখন দয়ামায়া করা

উচিত না।

সদরের কাছে রিকশার টুং টুং শব্দ হতে হীরেনের টগবগে ভাবনাটায় ছেদ পড়ল, বাঘাকে ছেড়ে দিয়ে হুলা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর এক ছুট।

একটা সাইকেল রিকশা। রমলা বসে আছে। রিকশা ভিতরের উঠোনে ঢুকল।

হুলা আহ্লাদে আটখানা। হুলার চোখে চোখ রেখে সুন্দর মানুষটি অল্প অল্প হাসছে।

হীরেনের কান দুটো গরম হয়ে উঠল। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছিল। তাহলেও মুখটা হাসি হাসি করে দাওয়া ছেড়ে তাকে উঠোনে নামতে হল।

৭

আসতে কষ্ট হয়নি?

না না, কষ্ট আবার কি। রমলা গাড়ি থেকে নামল। পরনে বাদামী রঙের সিল্কের শাড়ি। খোঁপায় দুটো বেলফুল গোঁজা। রোদে গরমে মুখটা বেশ লাল হয়ে গেছে, একটা তেলতেলে ঘামঘাম ভাব। যেন এই জন্য মুখখানা বেশ একটু:কচি দেখাচ্ছিল, নরম দেখাচ্ছিল।

রিকশাওয়ালাকে গাঁয়ের নাম বলে দিলাম, একটানে নিয়ে এল। রাস্তাঘাটও খারাপ না কিছু, সোজা রাস্তা।

বেশ বেশ। হীরেন খুশি, অন্তত খুশি হয়েছে চোখে মুখে এমন একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল। তা হলে রিকশাটা ছেড়ে দেওয়া যাক।

রিকশাওয়ালা রৌদ্র থেকে সরে গিয়ে কদমতলার ছায়ায়

দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম মুছছিল। রমলা আড় চোখে একবার সেদিকে তাকাল।

তাই তো হুলা বলল, রিকশা ধরে রেখে লাভ নেই। এই রিকশাঅলা, তুমি চলে যাও।

দাঁড়া দাঁড়া, হীরেন ধমক লাগাল, এতটা রাস্তা বেচারা ছুটতে ছুটতে এল, একটু বিশ্রাম করুক, জলটল খাক, তা ছাড়া তার ভাড়া মেটাতে হবে না! বলে হীরেন ঘরের দিকে ছুটছিল। রমলা বাধা দিল।

এই শোন!

হীরেন ঘুরে দাঁড়াল। রমলা তার ছোট্ট ব্যাগ খুলছিল।

উহুঁ তা হবে না, সেটি হবে না, তুমি ভাড়া দেবে কেন, আমার বা'ড় বেড়াতে এসেছ, আমি ওর পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি, এই রিকশাওয়ালা, কত দিতে হবে? হীরেনকে হঠাৎ উত্তেজিত ব্যস্ত দেখাল।

রমলা অল্প শব্দ করে হাসল।

কি মুশকিল, এর জন্যে তুমি এত অস্থির হয়ে পড়লে, ঠিক আছে, যেন হীরেনকে আঘাত দেবার ইচ্ছে নেই, ঘাড় কাত করে হাতের ব্যাগ গুটিয়ে ফেলল রমলা। দেড় টাকা পাবে ও।

হীরেন ভিতরে গিয়ে টাকা নিয়ে এল।

রিকশাওয়ালা, তুমি বোসো, একটু জলটল খেয়ে যাও। ভাড়াটা তার হাতে তুলে দিয়ে হীরেন তৎক্ষণাৎ উল্লাসীর ঘরের দিকে ছুটল। উল্লাসী!

ডাক শোনার আগেই উল্লাসী দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। উঠোনে রিকশা, সাজগোজ করা সুন্দর একটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে, আবার কি না হেসে হেসে হুলার সঙ্গে কথা বলছে, সব দেখে শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে হুলার মা।

হুঁ, রিকশাওয়ালাকে মাটির কলসীর ঠাণ্ডা জল খেতে দাও, ক'খানা বাতাসা দাও, সে আবার এখনি ফিরে যাবে। কথাটা বলে হীরেন চলে আসছিল, দেখা গেল তুলার হাত ধরে রমলা কদমতলার দিকে এগোচ্ছে।

কিন্তু রিকশা যে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার যাবার ব্যবস্থা কি হবে। যেন একথা বলতেই রমলা তাড়াতাড়ি এদিকে ছুটে এসেছে।

কি মুশকিল! হীরেন হাসল, যেন একটু বিরক্তও হল। তুলা, তুই সেদিন কি বলেছিলি?

উহুঁ, তুলা জোরে মাথা ঝাঁকাল। আমি এখনো বললাম, রিকশা চলে যাবে, কর্তাবাবুর গরুর গাড়ি আছে, স্বরূপনগর ফেরার ভাবনা নেই, কিন্তু সেটা আজ কিছুতেই হবে না, একটা জায়গায় বেড়াতে এসে একদিন দু'দিন না থাকলে এ আবার কেমন আসা?

তুলার কথা শুনে রমলা খিল খিল করে হাসল। হীরেনও হাসল।

হাসি থামতে রমলা বলল, এলাম একটু বাড়িটা দেখে যাব, জায়গাটা দেখে যাব বলে, তারপর বেলাবেলি ফিরে যাব, তা না, দু'দিন আমায় থাকতে হবে, কি সাংঘাতিক বায়না ধরেছে তোমার শিষ্য। হীরেনের চোখের দিকে তাকাল রমলা।

সাংঘাতিক কিছুই না, হীরেন মাথা নাড়ল। বেড়াতে এসেছ, দু'দিন থাকবে, এটা এমন কিছু বায়না না তুলার।

উল্লাসী ইতিমধ্যে ঘটি করে ঠাণ্ডা জল ও একটা প্লেটে কিছু বাতাসা সাজিয়ে এনে রিকশাওয়ালাকে খেতে দিল। তারপর জড়োসড়ো হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নতুন মানুষটিকে আবার মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।

এই উল্লাসী, হীরেন পরিচয় করিয়ে দিল, আমার একটি বন্ধু, আমরা এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম, এখন স্বরূপনগর ইস্কুলে মেয়েদের

পড়ান, আর এই হল হুলার মা। আমার এখানে থাকে, রান্নাবান্না ঘর দুয়ার গোছানো, চাষীর সংসারে এটাওটা দেখাশোনা, সবই এই মানুষটি করছে।

রমলা দেখল প্রায় তার বয়সের একটি মেয়ে। কালো রং। কিন্তু মুখখানা সুন্দর, গড়নটিও চমৎকার। এমন তাগড়া জোয়ান ছেলে হুলা তার সন্তান, হঠাৎ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

আর উল্লাসী তো তাকিয়ে তাকিয়ে তখন থেকে সুন্দর মানুষটিকে দেখছিল। কেমন মাজা-ঘষা নরম হাত পা, কতবড় খোঁপা এবং বয়সটা যে তার কাছাকাছি হবে তাও সে ঠিক ধরে ফেলল। কিন্তু ঐ একটা কথা, 'বন্ধু', কেমন খটকা লাগছিল উল্লাসীর। বেটাছেলে মেয়েছেলে বন্ধু হয়, আর যেন সে শোনেনি, তা-ও কি না একা একা সেই মেয়েছেলে আইবুড়ো একটা পুরুষ বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে চলে এল। হুঁ, আইবুড়ো, এখানে এসে হীরেন এমন পরিচয়ই দিয়েছিল নিজের। আজও সে বিয়ে করেনি, এবং কোনদিন যে আর বিয়ে করবে সেরকম সম্ভাবনাও দেখছে না, কেননা একলা জীবনই তার ভাল লাগে।

যাই হোক, উল্লাসী দেখছিল, কর্তাবাবুর বন্ধু এই মেয়েছেলেটিরও যেন বিয়ে হয়নি। সাদা সিঁথি ধূ-ধূ করছে, যেন কোনদিন সিঁদুরে আঁচড় পড়েনি। যদি বিধবা হয়ে উল্লাসীর মতন সিঁথি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে? তা-ও অসম্ভব না, উল্লাসী অনুমান করল। হয়তো বিয়ে একটা হয়েছিল। মোট কথা নতুন মানুষটিকে দেখে নানা কারণে উল্লাসীর চোখের পলক পড়ছিল না।

রমলা? হীরেন যেমন করে পরিচয়টা দিল, শুনে সে ঠোঁট টিপে হাসছিল। অবাক মোটেই হয়নি, বরং কাতুকুতু খেয়ে সুড়সুড়ি লাগার মতন ভিতরে ভিতরে একটা মজা অনুভব করছিল সে।

না, হীরেনের ওপর এই জন্য রাগ করেনি, বরং মনে মনে তাকে

অনুকম্পা করছিল, তাই তো, এ ধরনের পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কি পরিচয় দিত সে বাড়ির একটা ঝিয়ের কাছে, ঝি কেন, যারা তাদের চেনে না জানে না, সকলের কাছেই হীরেনকে এমন কথা বলতে হত। অবশ্য অন্য কিছু বলাতেও দোষ ছিল না, কিন্তু হীরেন নিশ্চয়ই সেটা চাইছিল না, একটা মিছে সম্পর্কের সূতো দিয়ে রমলাকে জড়িয়ে রাখতে তার হয়তো বাধোবাধো ঠেকছিল।

কথাটা মনে হতে, ঠোঁট টেপা হাসি সত্ত্বেও, রমলা টের পেল, একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে ওপরে উঠতে চাইছে, যেন জিনিসটা লুকোতে তাড়াতাড়ি চোখ তুলে সে মাথার ওপর কদম-গাছটা দেখছিল।

কি হল চুপ করে আছ যে! হীরেন আস্তে বলল। রমলা চোখ নামাল।

ভাবছি। নতুন করে সে ঠোঁট দুটো টিপল।

ভাবাভাবির কি আছে, হুলা যা বলছে, দু'দিন এখানে থেকে যাবে।

কাপড় জামা কিছুই আনা হয়নি।

তার জন্যে ভাবনা। হীরেন শব্দ করে হাসল। কাল সকালে হুলাকে পাঠিয়ে দাও, তোমার যা যা দরকার নিয়ে আসুক, চাবিটা দিয়ে দিও, ঘর নিশ্চয় বন্ধ করে এসেছ? হুলা ঠিক গোছগাছ করে সব আনতে পারবে, আসবার সময় আবার তালা দিয়ে আসবে। পারবি না হুলা?

হুলা খুশি। বড় করে ঘাড় কাত করল।

জলটল খেয়ে প্রসন্ন মনে রিকশাওয়ালা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এবার তুমি হাতমুখ ধোও, বিশ্রাম কর—উল্লাসী চা-টা করে দিক। উল্লাসী! হীরেন উল্লাসীর দিকে ঘাড় ফেরাল। আমি একটু ঘুরে আসছি, এখনি ফিরব—

উল্লাসী চুপ থেকে মাথা নাড়ল।

তুমি কোথায় চললে ? রমলা এবার হীরেনের দিকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াল।

একটু জেলেপাড়ায় যাচ্ছি—দেরী করব না, চলে আসব।

হীরেন আর দাঁড়াল না। গায়ে গেঞ্জি পরনে লুঙ্গি, ঐ অবস্থায়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জেলেপাড়ায় কেন ? রমলা হুলার দিকে তাকাল।

বা-রে, একগাল হাসল হুলা। কর্তাবাবু সামনে নেই। কাজেই তার কথায় তাকানোয় একটা স্বাধীনতার ভাব ফুটে উঠল। বাড়িতে অতিথি এসেছে মাছটাছ ধরতে হবে না ? কর্তাবাবু জেলেদের খবর দিতে গেলেন।

পুকুরটা কোন্ দিকে ?

ঐ তো। হুলা আঙুল তুলে পূবদিকের ঝোপঝাড় দেখাল। ওপাশেই মস্ত পুকুর—দীঘি! রমলার চোখে চোখ রেখে সে মাতব্বরের মতন হাসল। সব ঘুরেটুরে তোমাকে দেখাব, এসেছ যখন—বাবুর ক্ষেত খামার পুকুর ফলের বাগান, কোন্ জমিতে পাট হয়—কোন্ গাছে টক আম হয়, কোন্‌টার আম মিছরির মতন—সব দেখে যাবে। দু' দিনের আগে তোমাকে স্বরূপনগর ফিরতে দেওয়া হবে না বলা হয়েছে, দরকার হলে আর একদিন থেকে যেতে হবে—আমিই বাবুকে বলব।

আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে। হুলার কাঁধে হাত রাখল রমলা।

হুলার চোখে মুখে উৎসাহের বান ডাকছিল। এস, ঘরে এসে বসো। রমলাকে নিয়ে সে হীরেনের দাওয়ায় উঠে গেল। ভিতর থেকে একটা বেতের মোড়া টেনে এনে রমলাকে বসতে দিল। আমি তোমার মুখ হাত ধোবার জল নিয়ে আসছি।

বালতি হাতে করে হুলা পাতকুয়ার দিকে ছুটল। উল্লাসী ওপাশে উনুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চা করতে হবে।

৮

খাওয়াদাওয়া শেষ করতে বেশ একটু রাত হল।

পুকুর থেকে এতবড় একটা রুইমাছ ধরা হয়েছিল। ছুলা মাছ কেটেকুটে দিয়েছে।

উল্লাসী রান্না করেছে। বাড়িতে অতিথি এসেছে, অন্য দিনের চেয়ে দু' চার পদ বেশি রাঁধতে হয়েছে, বেশ যত্ন করে উল্লাসী মাছের কালিয়া মুড়ি ঘণ্ট মাছের ঝাল ইত্যাদি রান্না করেছে, রমলা খেয়ে খুশি, বার বার উল্লাসীর হাতের রান্নার প্রশংসা করছিল, হীরেন ও রমলা একসঙ্গে টেবিলে খেতে বসেছিল, ছুলাও তাদের সঙ্গেই খাচ্ছিল, তবে ছোট টেবিলে দু'জনের বেশি জায়গা হত না বলে ছুলাকে মাটিতে আলাদা আসন বিছিয়ে বসতে হয়েছিল। উল্লাসী পরিবেশন করছিল।

খেতে বসে রমলার সঙ্গে অন্য আর বিশেষ কোন কথা হয়নি।

হীরেনের পুকুর নিয়ে মাছ নিয়ে, তার ক্ষেত খামার ইত্যাদি নিয়ে দু' চারটে কথা হয়েছে।

রমলা লক্ষ্য করছিল, হীরেন যেন একটু গম্ভীর, সন্ধ্যার দিকে হুলা যখন বঁটি দিয়ে মাছ কাটছিল তখন রমলাও কাছে ছিল, হীরেন পাশে দাঁড়িয়ে পেটটা ক' টুকরো করতে হবে, গাদার মাছ ক' টুকরো হবে, হুলাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

তখনও হীরেন খুব হাসিখুশি ছিল। হুলাকে নিয়ে মাঝে মাঝে একটা দুটো রগড়ে কথাও বলছিল, যেমন, দা বঁটি হাতে উঠলে হুলার মেজাজ খুলে যায়, মনে হয় এক পুকুর মাঝ ধরে এনে দিলে সারা দিন সারা রাত বসে কুটতে পারবে, একটু বিরক্ত হবে না—কেমন তাই না হুলা।

হুলা কথা বলছিল না, সারা মুখে এতবড় একটা হাসি ঝুলিয়ে মাছ কুটতে ব্যস্ত ছিল। রমলা শব্দ না করে হাসছিল।

হীরেন আবার বলছিল, কেবল কি মাছ, একটা ছুরি হাতে তুলে দাও, দেখবে কেমন মেজাজ নিয়ে আমাদের হুলা মহারাজ হাঁস মুরগির গলা কাটছে, গাঁয়ের সব হাঁস মুরগি এনে ফেলে দিলেও অখুশি হবে না, নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে হাতের ছুরি সমানে চালিয়ে যাবে—কেমন তাই না হুলা ?

হুলা এবারও চুপ থেকে হাসছিল, হাতের কাজ শেষ করছিল। তখন হীরেন রমলার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, আমার সময় সময় মনে হয় হুলা আর এক জন্মে ঢাল তলোয়ার নিয়ে খুব যুদ্ধটুদ্ধ করেছিল, অনেক সৈন্যটৈন্য কেটেছিল, কাটাকাটির নেশাটা আজও রয়ে গেছে।

এবার রমলা শব্দ করে হেসেছিল। হুলা তেমনি নীরব। রমলা বলেছিল, না, না, তা হবে কেন, মাছ কাটুক আর হাস মুরগির গলা ছিঁড়ুক, ওর ভেতরটা নরম, চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায়, একদিন

দেড় দিনের আলাপ পরিচয়েই আমি বুঝে গেছি, মানুষটার ভেতরে যথেষ্ট মায়া দয়া আছে।

তাই না কি? সত্যি? হীরেন হেসেছিল এবং যেন খুবই একটা নতুন কথা শুনছে, রীতিমত অবাক হল, যেন এই প্রথম দেখছে হুলাকে, সামনের দিকে ঝুঁকে হুলার মুখের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তাই না কি হুলা? তোর ভেতরটা মাখনের মতো, মিছরির মতো? এই মানুষটি বলছে? তবে তো এতকাল একত্র থেকে আমি তোকে চিনতে পারিনি। ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে আমার।

কর্তাবাবুর ভাব-ভঙ্গি দেখে হুলার তখন কী হাসি, এক মিনিটের জন্য মাছ কাটা বন্ধ রেখে হো-হো করে হেসে কদমতলাটা মাত করে রেখেছিল।

কদমতলায় বসে মাছ কাটা হচ্ছিল। নতুন মানুষ দেখে প্রথমটা খুব জড়সড় হয়ে থাকলেও বিকেলের পর থেকে উল্লাসী কিন্তু বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, রমলার সঙ্গেও সে তখন দুটো একটা কথা বলেছে।

হুলাকে নিয়ে কর্তাবাবু সুন্দর মানুষটির সঙ্গে কথা বলছিল, কানে যেতে উল্লাসী কাজের ফাঁকে মাছ কাটার কাছে এসেও একবার দাঁড়ায়।

কর্তাবাবু কথা শেষ করার পর হুলা যখন খুব হাসছে, উল্লাসী তখন মুখ বেঁকিয়ে ছেলেকে ধমক দিয়েছে, আহা, আহ্লাদ ধরে না আমিও তো বলি তোর ভেতরটা পাষাণ, এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই, কসাইয়ের বাড়া তুই—উনি নতুন মানুষ, তোকে চেনেন না, দু'দিন থাকলেই তোর পরিচয় পেয়ে যাবেন।

না না, উল্লাসী, তুমি আবার এর মধ্যে এলে কেন! হাসতে হাসতে হীরেন বলছিল, তোমার ছেলে বলে একলা তুমিই হুলাকে

চিনে বসে আছ, আর কেউ চিনতে পারছে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। তা ছাড়া, আমি তো চোখের ওপর সর্বদা দেখছি, হুলা যদি গাছের পাতাটাও ছেঁড়ে, তুমি হাউমাউ শুরু করে দাও, যেন সাংঘাতিক একটা কাজ করেছে সে, যেন খুন জখমের মতন কিছু একটা করে বসল।

বুঝলে রমলা, হীরেন তখন রমলাকে বুঝিয়েছে, তুমি বলছ হুলার ভেতরটা নরম, কিন্তু তার মা উল্লাসীর ভেতরটা যে আরও কত নরম, কী ভয়ানক কোমল—যদি দেখতে। গাছের পাতাটা ছিঁড়লে, কুঁড়িটা ছিঁড়লে উল্লাসী কষ্ট পায়, যেন তারাও তার সন্তানের মতন, একটা পাতা নষ্ট হল না, যেন তার একটি সন্তান নষ্ট হল।

হুলা শুনে চুপ করে রইল। আর হাসছিল না। উল্লাসীও কথা বলছিল না।

রমলা উল্লাসীকে দেখছিল। তারপর হীরেনের দিকে তাকিয়েছে।

হুঁ, এমন মানুষ আছে বৈকি—গাছের পাতাটা কুঁড়িটা কেউ ছিঁড়ছে দেখলেও তাদের প্রাণ কাঁদে। কাজেই আমি যা বললাম, বাইরেটা শক্ত হলে হবে কি। হুলার ভেতরটা ফুলের মত নরম। মা এমন—কাজেই তার ছেলে ততটা না হলেও, কিছুটা তো হবেই। সত্যি কি না।

রমলার কথা শুনে হীরেন হেসে ঘাড় নেড়েছিল।

হুঁ, মাছ কাটার সময়ের ঘটনা এটা। রমলা লক্ষ্য করেছে, হীরেন তখন বেশ হাসিখুশি, কিন্তু তারপর থেকেই আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়।

খেতে বসে ঐ সামান্য দু'চারটে কথা, তার পুকুর, পুকুরের মাছ, বাগান চাষবাস ইত্যাদি নিয়ে রমলার সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া আলোচনা। আর উল্লাসীর হাতের রান্না নিয়ে কিছুটা প্রশংসা। তা-ও রমলাই

এই নিয়ে কথা বলছিল বেশি, হীরেন মাথা নেড়ে 'হুঁ' 'হ্যাঁ' গোছের সায় দিয়ে গেছে মাত্র। তার বেশি কিছু না।

হীরেনের শোবার ঘরে রমলার শোবার জায়গা হয়েছে। চারটে কামরার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় এবং খোলামেলা। উত্তর দক্ষিণে চারটে করে আটটা জানালা, ভিতর দিকে, মানে উত্তর দিকে দুটো দরজা এবং দক্ষিণ অর্থাৎ সদরের দিকে দুটো।

খাট চেয়ার আলমারী ড্রেসিং-টেবিল—সবই এঘরে রয়েছে। হীরেন পাশের একটা ছোট কামরায় শোবার জায়গা করেছে। এটা অনেকটা বৈঠকখানা হিসাবে হীরেন ব্যবহার করে। অবশ্য পাড়া গাঁয়ে আর বৈঠকখানা কী, কে-ই বা তার কাছে বৈঠক জমাতে আসে। কাজেই ঘরটা অধিকাংশ সময় তালা বন্ধ থাকে।

বাকি আর দুটো কামরার একটা কামরায় দুলা শোয় এবং আর একটা অনেকটা ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অর্থাৎ দুলার কামরা ঠিকই আছে, আর ভাঁড়ার ঘর তো ভাঁড়ার ঘরই রয়ে গেল, কেবল হীরেনের শোবার জায়গা বদলে গেল।

এই ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আর কী ব্যবস্থা করা যেত হীরেন ভেবে পাচ্ছিল না। কথায় বলে অতিথি সৎকার—অতিথির সুখ-সুবিধা আরামটাই আগে দেখতে হবে।

রমলাকে নিজের ঘরটা ছেড়ে দিতে হল। দুলার কামরা এবং হীরেন যেটায় শোবে—এই দুটো কামরা মাঝের বড় কামরাটার ডাইনে ও বাঁয়ে, এই দুটোও দক্ষিণমুখো। কেবল ভাঁড়ার ঘরটা পিছনের দিকে—সঙ্গেই চওড়া বারান্দা। সামনের দিকে বারান্দা তত চওড়া না।

পিছনের বারান্দায় বসে টেবিল বিছিয়ে রমলা ও হীরেন খেয়ে উঠেছে। তখন একটা হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছিল। ভিতরের উঠোনটা আলোয় ফটফট করছিল, হীরেনের রান্নাঘর ছাড়িয়ে ওদিকে

কদমতলা পর্যন্ত আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। উল্লাসীর পাতার ঘর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এখন এতবড় আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ওদিকের বারান্দা উঠোন কদমতলা সব অন্ধকার হয়ে গেছে।

রমলা ঠিকই করেছিল।

হীরেন সন্ধ্যার পর থেকে গম্ভীর হয়ে আছে। ইচ্ছে করেই গম্ভীর। জেলেপাড়া থেকে ফিরে এসে সে দেখেছিল হুলা রমলাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখাচ্ছে পুকুর দেখাচ্ছে, হীরেনের মুরগি কোথায় থাকে হাঁসের খাঁচা কোন্‌দিকে—কোথায় তার ধানের গোলা। পাটের মরশুমে কোন্‌ জায়গাটায় গাদা করে পাট রাখা হয়।

যেন রমলার যত না এসব দেখতে জানতে কৌতূহল, তার চেয়ে তাকে দেখাবার, খুঁটিয়ে সব বলার উৎসাহটা হুলার তরফ থেকে অনেক বেশি প্রকাশ পাচ্ছিল।

তা পাক, এই জন্য হীরেন ততটা ভাবত না, ছেলেমানুষ—এসব চঞ্চলতা থাকবেই, আর এ-ও সত্য কর্তাবাবুর গৌরবে তারও গৌরব, হীরেনের ঘর-দুয়ার, বাগান পুকুর, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, ধান-পাট, এমন কি বাঁশ ঝোপের বাঁশটা কলাবাগের কলার কাঁদিটা —সব কিছু হুলা নিজের বলে মনে করে—যে কারণে নতুন মানুষটিকে সব কিছু একটা বিকেলের মধ্যে দেখিয়ে শেষ করার লোভ সংবরণ করতে পারছিল না।

ভাল কথা, কিন্তু ছোঁড়া কি একটু বেশি, যাকে বলে 'মাত্রাতিরিক্ত' মেতে উঠেছে না ব্রজমাধব স্কুলের ঐ টিচারটিকে নিয়ে?

হীরেন তাই দেখছিল।

তখন বেলাশেষ। দুটিতে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে। একবার

পুকুর দেখা শেষ করে আবার হুলাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে স্বরূপনগরের মাস্টারনী ওখানটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জায়গাটাও নিরিবিলি। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে, লম্বা লাল রোদের রেখা দু'জনের গায়ে গিয়ে পড়েছিল।

হুলার খালি গা। ঘাড় ও পিঠের তেলতেলে কালো চামড়া টলটলে লাল রোদ লেগে আরো বেশি চকচকে তেলতেলে দেখাচ্ছিল।

আর ঠিক তার পাশেই অত্যধিক ফরসা নরম চামড়ার একটি মানুষ।

সূর্যাস্তের লাল আলোয় সেই চামড়া অবিকল পাকা ফজলী আমের শাঁসের চেহারা ধরেছিল।

দুপুরেব বেলফুল শুকিয়ে যাওয়াতে এখানে এসে চুলে একটা চাঁপা ফুল গুঁজেছে। ফুলটা যে হুলা এনে দিয়েছে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না।

এদিকে আর একটাও ফুল গাছ নেই। হুলাই সব কেটে শেষ করেছে। এক ভট্চাযদের বাগানেই চাঁপা গাছ আছে, ধারে কাছে আর কোথাও এই ফুল ফোটে না, হুলা কখন গিয়ে চাঁপা পেড়ে এনেছে চিন্তা করে হীরেন অবাক, বলতে কি, খোঁপার ঐ ফুলটা দেখেই তার মাথাটা আগে গরম হয়।

তাছাড়া যেমন বার বার ঢোক গিলছিল আর কথা বলছিল উল্লাসীর ছেলে, রেবতীর চায়ের দোকানের ছবিটা মনে পড়ে যায় হীরেনের।

এটা সত্য, সদরের কাছে সাইকেল রিকশার ওপর বসা মূর্তিটা দেখেই হীরেনের চোখ গোল হয়ে ওঠে, তখনই সে বুঝে গিয়েছিল, কিসের টানে বাঘিনী রসুলপুর ছুটে এল। বেশ তো, দেখা হয়েছিল। উনিশ বছর মানুষটার সঙ্গে, মনের যে গতি নিয়েই হোক, একত্র ঘর

করা হয়েছে। তারপর হঠাৎ যদি ভদ্রতার খাতিরে হীরেন তাকে বাড়ি আসার আমন্ত্রণ জানায়, তো ঠিক ঠিকই মানুষটা এতটা পথ ভেঙে হীরেনের উঠোনে এসে দাঁড়াবে, বিশ্বাস করতে কেমন যেন লাগছিল।

ডাইভোর্স হয়ে গেছে, তারপর কোন্ স্ত্রী আবার একদিন স্বামীর বাড়ি বেড়াতে যায়! না কোন্ স্বামী তার পরেও স্ত্রীর আস্তানায় গিয়ে ঢুঁ মারে।

এমন ঘটনা হীরেন চোখে দেখেনি, শোনেওনি। কাজেই তাকে অবাক হতে হয়েছিল।

কিন্তু এক সেকেণ্ড ছিল বিস্ময়ের ভাবটা। সেই মুহূর্তে হুলাকে রিকশার পাশে ছুটে যেতে দেখে এবং তার চোখে চোখ রেখে সর্বনাশা ঐ স্ত্রীলোক যেমন মোহিনী হাসি হাসছিল, সব রহস্য তখন জল হয়ে যায়, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে হীরেনের।

হীরেনের জন্য আসেনি রাক্ষসী, তার কাছে আসেনি, এসেছে তাগড়া জোয়ান ছোঁড়াটার লোভে, নতুন রক্ত টগবগ করছে ঐ শরীরে, এর উত্তাপ এর রোমাঞ্চ অনেক বেশি, যা হীরেনের মধ্যে পাবে না, হীরেনের বয়সী কোন পুরুষের মধ্যে পাবে না বা সেই সব পুরুষ, যারা তাকে গান শেখাত বাজনা শেখাত তারাও পুরোনো হয়ে গিয়েছিল, বাসি হয়ে গিয়েছিল। বাসি রক্ত কতদিন ভাল লাগে!

কাজেই এবার কলকাতা ছেড়ে অন্য জায়গায় চল, নতুন জায়গায় নতুন স্বাদের রক্ত যদি পাওয়া যায়। যে জন্য গানবাজনা ছেড়েছুড়ে স্বরূপনগরের স্কুলে চাকরি, তারপর ধাঁ করে হুলার সঙ্গে দেখা। যেন বাঘিনী কচি বয়সের নধর পুষ্ট ছাগলের দেখা পেল।

পুকুরপাড়ে দু'জনকে দেখে ঠিক এই উপমাটাই হীরেনের মনে এসেছিল। বেলা শেষের লাল আলোয় বাঘিনীর চোখ জ্বলছিল, ঠোঁট জ্বলছিল।

চিরকাল যা করেছে, এখনও রমলা ঠোঁটে রং লাগায়। রেবতীর চায়ের দোকানে অবশ্য রংটা ছিল না, সেখানে শিক্ষয়ত্রী, একটু রয়েসয়ে সাজগোজ করতে হয়, কড়া কিছু করতে গেলে চাকরি নট।

আজ রসুলপুর বেড়াতে এসে আবার সেই পেথম-ধরা সাজ। পেটকাটা ব্লাউজ। লাল টুকটুকে রক্ত খাওয়া ঠোঁট। বাদামী সিল্কের ওপর বাঁশঝোপের আড়াল দেওয়া চিকরি কাটা রোদ লেগে অবিকল ডোরাকাটা বাঘিনী।

তেমনি হুলা। উদম গা। কালো শরীর। ঠিক যেন ছাগলটা। বাঘিনী ছাগলটাকে বশ করে ফেলেছে। কোনদিকে আর নড়বার শক্তি নেই তার। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রমলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হুলা।

দেখে হীরেনের রাগ যেমন, হাসিও পাচ্ছিল।

মোটকথা এখানে এসে অবধি ভদ্রমহিলা কেবল হুলার সঙ্গে। এখনও হুলাকে ছাড়ছে না। হুলা মশারী খাটিয়ে দিচ্ছে। বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে। জলের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে। দেশলাই? রাত্রে যদি দেশলাইয়ের দরকার হয়?

এপাশের ছোট ঘরে বসে হীরেন কান খাড়া করে আছে। বাথরুমে যাবে সুন্দরী। হুলা হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে অন্ধকারে পথ দেখাচ্ছে।

কাজেই একলা ঘরে বসে হীরেন দাঁতে দাঁত ঘষছিল। কিছুই করা হল না। আবার সে হেরে গেল।

কোথায় তার হাতের অস্ত্র! অস্ত্র একটা তৈরি করেছিল ঠিকই কিন্তু সেটা যে এমন ভোঁতা হয়ে যাবে, কাজের সময় এমন অকেজো হয়ে পড়বে কে জানত।

অথচ কাল দুপুরেও বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে দু' দুটো কুকুরের মাথা ফাটিয়েছে ছোঁড়া। আজ দুপুরে তামাক কাটার দা দিয়ে

কাঠবিড়ালটাকে যখন কুচিয়ে কাটছিল, তখন কেমন চেহারা হয়েছিল হুলার। কপালে রক্ত হাতে রক্ত। রক্ত দেখে উঠোনে ধেই ধেই নৃত্য। যেন পৃথিবীর আরো অনেক কিছু কেটেকুটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারলে সে ঠাণ্ডা হত।

এখন তার চেহারা দেখলে কে একথা বিশ্বাস করবে। ঐ হাত দিয়ে হুলা এত ফুল গাছ কেটেছে, আবার ঐ হাত দিয়ে ভট্‌চাজদের বাগান থেকে চাঁপা ফুল পেড়ে এনেছে আর একজন খোঁপায় পরবে বলে।

তাহলে তো, সেদিন স্বরূপনগরের চায়ের দোকানে বসে হীরেন যেমন ভেবেছিল, ঈশ্বর সত্যি তার সঙ্গে রসিকতা করছে, রমলার সঙ্গে আবার দেখা হওয়াটা কিছু না, আসল ঠাট্টাটা ঈশ্বর হুলাকে নিয়ে করল।

হীরেনের ইচ্ছা করছিল কান ধরে ছোঁড়াকে ঘর থেকে টেনে আনে, ধমক দিয়ে তাকে তার ঘরে শুতে পাঠিয়ে দেয়। হাজারবার করে দেশলাই লাগবে পাখা লাগবে জল লাগবে, ওই জানালার পাল্লাটা ভেজিয়ে দেব, এদিকের জানালার পর্দাটা তুলে দেব,—অর্থাৎ কিছুতেই ছাগলটা ওঘর থেকে সরছে না। সরছে না, তাকে সরতে দিচ্ছে না ডাইনী।

৯

শরীরে মনে বিশ্রী একটা অবসাদ বোধ করছিল হীরেন।

একলা ঘরে একটু সময় পায়চারি করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে পরে জানালার কাছে দাঁড়াল।

চৈত্র রাতের ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস চোখে মুখে লাগতে কতকটা সে স্বস্তিবোধ করল। এটা সদরের দিকের জানালা। সরে গিয়ে অন্দরের দিকের জানালাটা খুলে দিল।

কাল পঞ্চমী গেছে আজ শুক্লা ষষ্ঠী। পাতলা ফিনফিনে জ্যোৎস্নাটুকু এবার সরে যাবে, কাজেই রাত বেশি হয়েছে ঘড়ি না দেখেও অনুমান করা চলে।

বারান্দায় বাঘা শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে কান নাড়ছে মাথা নাড়ছে, শোয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝেড়েছে টের পাওয়া গেল। ভিতরের উঠোনের প্রায় সবটুকু জ্যোৎস্না ঝাঁকড়ামাথা

কদমগাছটার আড়ালে চলে গেছে। উল্লাসীর পাতার ঘরের চালে সিকি আধুলীর সাইজের টুকরো টুকরো চাঁদের আলো পড়ে নাচানাচি করছে। হাওয়ায় কদমপাতা নড়ার খসখস শব্দ হচ্ছিল।

নিশ্চয় উল্লাসী এখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে, হীরেন চিন্তা করল, পৃথিবীর সাতে পাঁচে নেই, কোনরকম জটিলতার ধার ধারে না সে। শান্ত উদ্বেগহীন গাঢ় ঘুম তার চোখে আজও নেমে আসে। কিন্তু হুলা, উল্লাসীর ছেলে?

হীরেন না হয় জটিলতায় ভুগছে, তার মগজে মনে অনেক বিশৃঙ্খলা। তেমনি ঐ ভদ্রমহিলা, যার নাম রমলা, এককালে যে হীরেনের স্ত্রী ছিল, কলকাতার গাইয়ে বাজিয়েরা যার হাতের মুঠোয় ছিল, তারপর গাইয়ে বাজিয়েদের অরুচি ধরতে গানবাজনা ছেড়েছুড়ে স্কুলের মাস্টারনী সেজে স্বরূপনগরে এসে যে আস্তানা গাড়ল, তার মাথায় অনেক জটিলতা, অনেক পাপচক্র দুষ্ট ষড়যন্ত্র, হীরেনের মতো এই মানুষটির চোখেও ঘুম আসবে না জানা কথা।

কিন্তু এই সময়টায় জন্তুর মতন পড়ে পড়ে যার ঘুমোবার কথা, ঘরের চালে বাজ পড়লেও যার হুঁস হয় না, ঘুম ভাঙে না, এত রাত পর্যন্ত কোনদিন যাকে জেগে থাকতে দেখা যায় না, তার চোখের ঘুম আজ কে কেড়ে নিয়েছে, হুলার মাথায় আজ কোন্ জটিলতা এসে বাসা বাঁধল!

যেন নতুন করে অধৈর্য হয়ে উঠে হীরেন পিছনের জানালা ছেড়ে সদরের দিকের জানালায় এসে দাঁড়াল।

এখনও পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। এখনও আলো নেবেনি। আবার বুঝি হুলা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে মহারাণীকে খেতে দিল, হাতপাখা নেড়ে হাওয়া করছে, পা টিপে দিচ্ছে কপাল টিপে দিচ্ছে।

হুঁ, সুন্দর মেয়েছেলেটির পা টিপছে কপাল টিপছে বেকুব,—

হীরেন এমন ছবিও কল্পনা করল। কাজেই যেখানে এত ভক্তি এত বংশবদ ভাব সেখানে হুলা ছোরা ধরবে, বা মাথার এক গাছি চুল ছিঁড়বে বা ঘেন্নায় গায়ে থুথু ছিটোবে, কোনদিন তা হবার নয়। হীরেনের এসব আকাশকুসুম কল্পনা।

হাতের সিগারেটটা রাগ করে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জোনাকীর মতন উড়ে গিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা বাগানের ভিতর পড়ল।

মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল হীরেনের, দেওয়ালে কপাল ঠুকতে পারলে তার ভাল লাগত। অশোক মিত্তির লেনের বাড়িতে যা প্রায়ই হয়েছে।

কত বড় আস্পর্ধা! একটা নষ্ট মেয়েছেলে তার বাড়িতে, তার শোবার ঘরে, তার খাটের ওপর বসে তার একটা জোয়ান চাকরকে দিয়ে হাত টেপাচ্ছে পা টেপাচ্ছে। তার হাতের বাতাস খাচ্ছে। রাত দুপুরেও ছোঁড়াকে তার ঘরে শুতে যেতে দিচ্ছে না।

দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে হীরেন পাশের ঘরের দরজায় লাথি মারত, চিৎকার করে হুলাকে ডাকত, কিন্তু তার আগেই সে স্থির হয়ে গেল, কেমন যেন কাঠের মতন হঠাৎ শক্ত হয়ে রইল। তার ঘরের দরজায়, কড়া নাড়ছে না, কেউ যেন আঙুলের টোকা দিয়ে টুকটুক শব্দ করছে।

কে! ভয় পাওয়ার মতন গম্ভীর গলায় হীরেন সাড়া দিল। হুলা না, সে বেশ বুঝতে পারছিল, হুলা এভাবে টুকুটুক করে দরজায় টোকা দেয় না।

উল্লাসীও না, কদমতলা ছেড়ে এত রাত্রে উল্লাসীর এই মহলে আসা 'জলে আগুন লাগা'র মতন একটা অসম্ভব ব্যাপার। কোনদিন আসে না।

তবে কি রমলা? আর টুকটুক শব্দ হচ্ছে না। বোঝা গেল

তার সাড়া পেয়ে দরজার বাইরে মানুষটি অপেক্ষা করছে, আশা করছে এখনই দরজা খোলা হবে।

কিন্তু হীরেন তখনই দরজা খুলল না।

কে! গলার স্বরটা এবার রুক্ষ করে ফেলল সে!

আমি।

অর্থাৎ রমলা। অন্ধকারে হীরেন এক সেকেণ্ড ভুরু কুঁচকে রাখল। তার কপালে ঘাম দেখা দিল। অন্তত সে বুঝল তার কপাল ঘামছে। হাতের তেলো ঘামছে। হঠাৎ রমলা এ ঘরের দরজায়?

কিন্তু হীরেন সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল, স্বাভাবিক হয়ে গেল। হয়তো কোন দরকারী কথা বলতে এসেছে বা কোন জিনিসের দরকার হতে পারে।

দরজা খুলে দিল সে।

চৌকাঠের বাইরে ঋজু সুঠাম শ্বেতাভ মূর্তি দাঁড়িয়ে। হীরেন তার একটা ধোয়া কাপড় খুলে দিয়েছিল। বোঝা গেল রমলা সেটা পরেছে। সরু পাড়। আবছা অন্ধকারে পাড়টা আর চোখেই পড়ছিল না। তাই মনে হচ্ছিল রমলা সাদা থান পরেছে। বিধবা মানুষ।

ঘরে এস। হীরেন ডাকল।

ঘর যে অন্ধকার। শুয়ে পড়েছিলে নিশ্চয়? রমলা চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে এল।

হুঁ, শুয়ে পড়েছিলাম। হীরেন মিথ্যা কথাই বলল। তুমি শুয়ে পড়েছিলে।

না। রমলা সত্য কথা বলল। গলার স্বরটা ভারি।

দাঁড়াও আলোটা জ্বেলেনি। হীরেন যেন দেশলাই খুঁজছিল।

আলো জ্বালার দরকার হবে? রমলা ক্ষীণ গলায় বলল। কেবল

একটা কথা বলতে এসেছি তোমাকে।

হীরেন শব্দ করল না। তার হাতে দেশলাই নড়াচড়ার শব্দ হল। রমলা ভেবেছিল হ্যারিকেন ধরানো হবে। দেখা গেল হীরেন মোম জ্বেলে দিয়েছে। একটা ছোট টুলের ওপর হীরেন আলোটা বসিয়ে দিল।

তুমি বোসো। হীরেন আঙুল দিয়ে তার তক্তপোশের বিছানাটা দেখাল। অথচ বৈঠকখানা বলে ঘরে কয়েকখানা চেয়ার সাজানো ছিল। রমলা কি মনে মনে হাসল? হীরেন তার সাদা ধবধবে বিছানায় বসতে বলছে। কিন্তু মাস্টারনীর চেহারায় সেরকম কোন লক্ষণ সে দেখতে পেল না, বরং যেন অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে আছে।

তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। রমলা গলাটা একটু এদিকে ঝুঁকিয়ে দিল।

বল। রমলা তক্তপোশের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসতে হীরেন মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল।

জানালা দিয়ে একটু একটু হাওয়া ঢুকছিল। মোমের শিখাটা কাঁপছিল। হীরেন এক পলক বাতিটা দেখল। তারপর রমলার দিকে চোখ রাখল।

এতক্ষণ হুলা আমার ঘরে ছিল। রমলা শুকনো গলায় বলল।

তাই না কি? হীরেন অবাক হবার মতন চেহারা করল। এখন শুতে গেছে?

আমি বলে কয়ে পাঠিয়েছি। যেতে চাইছিল না।

গল্প করতে চাইছিল রাত জেগে?

রমলা শব্দ করল না। হীরেন লক্ষ্য করল বাতির শিখার মতন রমলার চোখের পাতা দুটো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে কেঁপে উঠল। যেন চঞ্চলতা ঢাকতে তাড়াতাড়ি হীরেনের পিছনে দেওয়ালে ঝুলানো ক্যালেণ্ডারের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে সে দেখতে আরম্ভ করে দিল।

হয়তো মোমের নরম আলোর জন্য রমলার মুখটা ঈষৎ করুণ ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

হুলা তোমাকে খুবই ভালবেসে ফেলেছে। যেন খুবই একটা হালকা কথা, নিরীহ বিষয়। হীরেন সামান্য হাসল।

রমলা হাসল না। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

কিন্তু তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ করেছে? হাসি নিবিয়ে হীরেন চোখে মুখে খানিকটা উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলল।

তেমন কিছু না। রমলা ছোট করে হাই তুলল। মাথা ধরেছে। হুলা কপালটা টিপে দিল। একটু আরাম লাগছিল।

তা তো লাগবেই। অট্টহাস্য করে উঠতে পারলে হীরেন শান্তি পেত। কিন্তু সংযত হয়ে গেল। আমার কাছে অবিশ্যি মাথাধরার বড়ি ছিল। খাবে একটা ট্যাবলেট!

না, আর দরকার হবে না—এখন অনেকটা কমে গেছে, আস্তে আস্তে সেরে যাবে।

আসবার সময় মাথায় রোদ লেগেছিল। রিকশাওয়ালাকে ছাউনিটা তুলে দিতে বলনি নিশ্চয়?

রমলা মাথা নাড়ল।

ও চেয়েছিল তুলে দিতে, আমি বললাম, থাক—নতুন জায়গায় যাচ্ছি, চারদিকটা দেখতে দেখতে বেশ যাওয়া যাবে।

তা তো দেখতে দেখতে এলে, হীরেন বিড়বিড় করে উঠল, ওদিকে এতটা রোদ লাগিয়ে মাথায় যন্ত্রণা বাধিয়ে আনলে।

এ আর একটা কী যন্ত্রণা! বলে রমলা হঠাৎ চুপ করে আবার ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখতে লাগল। যেন মাথার যন্ত্রণা কিছু না, যেন অন্য আরো বড় যন্ত্রণা ভিতরে আছে, তার গলার সুরে এমন কিছু ইঙ্গিত ছিল না কি?

হীরেন একটু কৌতুকবোধ করছিল। চুপ করে রইল।

যে কথা তোমাকে আমি বলতে এসেছি। রমলা এদিকে চোখ ফেরাল। এই জন্যই আমার রসুলপুর আসা—

বল। মেরুদাঁড়া টান করে বসল হীরেন। এবার সে কিছুটা বিস্ময় বোধ করল। এমন কি জরুরী কথা আছে যে হীরেনের কানে সেটা তুলতে তাকে রসুলপুর ছুটে আসতে হয়েছে? তা না হয় এল, সারাটা বিকেল গেল সন্ধ্যা গেল—এখন কি না মধ্যরাত্রে সময় হল সেই ভয়ংকর দরকারী কথা বলার জন্য সরাসরি হীরেনের শোবার ঘরে ছুটে আসবার। হীরেন একটু অধৈর্য হয়ে উঠল।

তুমি আমায় ক্ষমা কর।

কেন! হঠাৎ ক্ষমা চাইছ? হীরেনের চোখ বড় হয়ে উঠল।

যেন মাথার যন্ত্রণা কিছুতেই কমছে না। বাঁ হাতে কপালের রগ দুটো টিপে ধরে রমলা শুকনো গলায় বলল, আমি আজ অনুতপ্ত, অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে!

কিসের অপরাধ, হীরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন একটা চেহারা করল, একটু হাসলও। কবে তুমি অপরাধ করলে!

সারা জীবন, বিয়ের পর থেকে সারা জীবনই তোমার ওপর অবিচার করেছি, অন্যায় করেছি।

সে তো শেষ হয়ে গেছে, কবেই সব চুকেবুকে গেছে—এখন আবার নতুন করে—

না না, নতুন করে না। রমলা কপাল থেকে হাত সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দু' বছর ধরে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে, দু' বছর আগে সেই ভয়ংকর দিনটার কথা তুমিও নিশ্চয় ভুলে যাওনি—যেদিন মুখ শুকনো করে কোর্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তার একটা পানের দোকানের সামনে দু' মিনিট দাঁড়ালে, যেন একটা ডাব না সরবৎ দাম করছিলে, খুব তেষ্টা পেয়েছিল তোমার বোঝা যাচ্ছিল, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা ফিরিয়ে নিলে,

আর দাঁড়ালে না তেষ্টা নিয়ে মুখ কালো করে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলে গেলে—

সব তোমার মনে আছে। এবার হীরেন কষ্ট করে হাসল। আমার কিছুই মনে নেই—সব ভুলেটুলে বসে আছি। কিন্তু—একটা ঢোক গিলল হীরেন—এসব আর নতুন করে তোলা কেন রমলা, বলছ, কোর্ট থেকে বেরিয়ে দু'জন দু'দিকে চলে গেলাম, সেখানেই সব ফুরোল, সেদিনই সব শেষ হল—সব যখন খুঁটিয়ে মনে রেখেছ, তারপর আর তো কিছু বলার দরকার পড়ে না।

ওফ্, কী বোকা তুমি! অস্ফুট আর্তনাদের মতন শব্দ করল রমলা। না, সেদিন সব ফুরোল বলছ কি, সেদিন থেকেই তো আরম্ভ হল আমার যন্ত্রণা, আমার বুকের আগুন। তোমার শুকনো মুখটা যদি শেষবারের মতো না দেখতাম! বালিগঞ্জে দাদার বাসায় ফিরে গিয়ে দোরে খিল এঁটে একলা ঘরে মেঝেয় লুটিয়ে কাঁদলাম, মাথার চুল ছিঁড়লাম, এ আমি কী করলাম, আজ থেকে সারাজীবন যে আমাকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে—একটা নিরীহ মানুষকে এমন করে জীবন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম, আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না—

হীরেন চুপ। রমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। অন্তত হীরেন তাই দেখল, স্বরূপনগরের টিচার আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। বারান্দায় বাঘা যেন আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে কান লেজ ঝাড়াঝাড়ি করছিল। আর কোন শব্দ ছিল না।

ঝলক দিয়ে চৈত্র রাত্রির বাতাস জানালা গলিয়ে ঘরে ঢুকছিল। মোমবাতিটা এক সময় প্রায় নিবে যাচ্ছিল। তারপর হাওয়াটা কমতে বাতির শিখা আবার স্থির হয়ে যাচ্ছিল।

এখন তুমি আমায় কী করতে বলছ? হীরেন না বলে পারল না।

কিছুই করতে হবে না। শুধু তুমি আমায় ক্ষমা করবে। আর কিছু চাইছি না, তুমি আমায় ক্ষমা করছ জানতে পারলে শান্তি নিয়ে আমি এখান থেকে ফিরতে পারব।

হীরেন আবার চুপ করে রইল।

রমলা বলল, জানি তুমি ক্ষমা করবে না, কোন পুরুষই এমন স্ত্রীকে ক্ষমা করবে না—কিন্তু তবু তো কথাটা আমাকে বলতে হবে—আমি যে অনুতপ্ত, দুঃখী, তারপর থেকে একদিনের জন্যেও শান্তি পাইনি—অন্তত এই কথাটাও তোমাকে জানাতে পারলে ভাবব অপরাধের বোঝাটা একটু লাঘব হল, বুকটা হাল্কা হল। গান-বাজনার কথা বলছিলে, দাদার বাসায় সেদিনই ফিরে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর না, অনেক হয়েছে—গানবাজনার জন্যেই আমার আজ এই পরিণতি। তাই হল, তার পর থেকে গানবাজনার নাম শুনলেও আমার গা-বমি করত, ভাবলাম অন্য কিছু করব, কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না যদিও একটা কিছু নিয়ে তো সময় কাটাতে হত—হঠাৎ একদিন কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—দরখাস্ত পাঠাতে স্বরূপনগরের এই চাকরিটা হয়ে গেল, ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু ভেতরের যন্ত্রণা, বুকের আগুন? জানি না, বিশ্বাস করবে কি না, এই দু' বছর রোজ আমি ঈশ্বরকে ডেকেছি, একবার, অন্তত একটু সময়ের জন্যও যদি মানুষটার সঙ্গে আবার দেখা হত। ঈশ্বর আমার কথা শুনেছিল। হঠাৎ সেদিন দুপুরে, তা-ও এমন একটা বাজে চায়ের দোকানে, কোনদিন আমি যেখানে যাই না, কেন জানি ইচ্ছা হল একটু চা খাই কাজেই বলতে হয়, ঈশ্বর আমার হাতে ধরে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, দেখলাম সেখানে তুমি।

হুঁ, হীরেন মাথা নাড়ল। আমিও আর কোনদিন ওই দোকানে ঢুকিনি—ল্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে বেরিয়ে হুলার সঙ্গে সেদিনই প্রথম ওখানে গেলাম, হুলা অবিশ্যি আগে থাকতেই

রেবতীর দোকানে আনাগোনা করছিল, সেদিন তার কথা শুনে যা বুঝলাম। হুলা এদিকে বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে কি না, হুঁ. তা ছাড়া, হুলা—

আশ্চর্য, হীরেন কি না সেই মুহূর্তে হেসে উঠে হুলার কথা আরম্ভ করে দিল, রমলা যে অনুতপ্ত, এই দু' বছর একদিনের জন্য তার মনে শান্তি নেই, প্রতিদিন ঈশ্বরকে ডাকছিল, হীরেনের সঙ্গে যাতে অন্তত একদিন একটু সময়ের জন্য দেখা হয়, হীরেনের কাছে ক্ষমা চাইবে সে, ক্ষমা চাইতে রসুলপুর ছুটে এসেছে—সব শুনে, চোখের ওপর ক্লান্ত বিষণ্ণ মানুষটিকে দেখে কোথায় হীরেন স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে থাকবে, দরকার হলে রমলার হাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দেবে, বিছানায় স্থির হয়ে আবার তাকে বসতে বলবে—তা না. হি-হি হেসে সে হুলার কথায় চলে গেল।

অবশ্য রমলাকে নড়েচড়ে দাঁড়াতে দেখে সে চুপ করল।

তুমি ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে, আর তোমাকে কষ্ট দেব না। হীরেনের দিকে না, দরজার দিকে চোখ রেখে রমলা কথাটা বলছিল।

হীরেন মনে মনে চাইছিল, তার মুখের দিকে স্বরূপনগরের টিচার আরও একবার ছলছল করে তাকাবে, আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলবে, কিন্তু তা আর হল না, মাথা গুঁজে আস্তে আস্তে মানুষটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং এটাও কেমন অবিশ্বাস্য, রমলা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে একসঙ্গে এতটা হাওয়া ঘরে ঢুকল, সঙ্গে কিছু শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে এল এবং যেন রাগ করে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল।

এটাও ঈশ্বরের ইচ্ছা কি না হীরেন বুঝতে পারছিল না। অন্ধকারে হাতড়ে দেশলাই খুঁজে নিয়ে সে আর একটা সিগারেট ধরাল।

সত্য কথা, অন্ধকার ঘরে মগজের ভিতর ভাবনা-চিন্তাগুলি যত চমৎকার খেলা করে, ঘরে আলো থাকলে তা হয় না। কেননা আলোর মধ্যে এটা ওটা চোখে পড়ে, নানাদিকে মন বিক্ষিপ্ত হয়, চিন্তার ধার বেগ কমে যায় এবং মূল চিন্তার সঙ্গে পাঁচটা এলোমেলো চিন্তা এসে জড়ো হয়ে মগজটাকে ঝাপসা অপরিচ্ছন্ন করে তোলে।

তাই হীরেন ভাবছিল, বাতাসের ঝাপটায় বাতিটা নিবে না গেলে সে হয়তো এখনও তাকিয়ে তাকিয়ে বিছানাটাই দেখত, হুঁ, রমলা যেখানটায় বসে ছিল, তোশকের টোল খাওয়া জায়গাটা সকলের আগে তার চোখে পড়ত এবং তখন সে ভাবত, রমলা সত্যি শুকিয়ে গেছে, আগের সেই ভরাট জমাট, যাকে বলে মাংসে ঠাসা 'গতর' নেই, তা হলে তোশকের ওপর, চাদরের ওপর আরো বড় হয়ে গভীর হয়ে একটা গর্তের ছাপ পড়ত।

কিন্তু রমলা বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়েছিল সেই ছাপ কত অস্পষ্ট অপরিষ্কার, একটা মানুষ শুকিয়ে গেলে শরীরের মেদ মাংস কমে গেলে যা হয়।

আর এই চিন্তার সূত্র ধরে, হীরেন কি না রমলার শরীরের আরো পাঁচটা অংশ, অর্থাৎ কোমর পাছা ছাড়াও, তার বুক গলা উরু বাহু পিঠ পেট ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতে লেগে যেত এবং এমনও হয়তো হত তখন, রমলার শরীর সম্পর্কে এই দুপুর রাতে সচেতন হয়ে ওঠার পর, তার পিছনে পিছনে হীরেনও ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, যেন রমলার সঙ্গে কথাটা শেষ হয়নি, ক্ষমা চাইতে এসেছে সে, তারপর হীরেনের কী কর্তব্য, কোন্ শর্তে কতটা ক্ষমা সে করতে প্রস্তুত ইনিয়ে বিনিয়ে সব বলতে বলতে সুড়সুড় করে রমলার শোবার জায়গায় সে চলে যেত।

তারপর কী হত? যেন তা-ও হীরেনের মুখস্থ।

অশোক মিত্তির লেনের বাড়িতে যাকে বলে 'সহস্র রজনী' একই

ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অনেক তিক্ততা, সারাদিনের অনেক বিষাক্ত চিন্তা—সেই সঙ্গে অপরিমেয় আক্রোশ আস্ফালন, কিন্তু যে মুহূর্তে রমলার বিছানার পাশে গিয়ে সে দাঁড়াল, রমলার বুক দেখল কোমর দেখল উরু দেখল ঠোঁট দেখল, সঙ্গে সঙ্গে সব তিক্ততা আক্রোশ কর্পূরের মতো উবে গেল। রমলা কিন্তু তাকে বিছানায় উঠতে দিচ্ছে না শরীরে হাত রাখতে দিচ্ছে না। তা হলে হবে কি, বিছানার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হীরেন মশারীর ধারগুলি ভাল করে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে, শিয়রের কাছে পাখাটা এই স্পীডে ঘুরবে না কি আর একটু বাড়িয়ে দেবে বা কমিয়ে দেবে, গলা বাড়িয়ে কাতরস্বরে প্রশ্ন করছে।

হুঁ, আলোর এই অভিশাপ, শরীর দেখার, শরীর নিয়ে চিন্তা করার এই সব যন্ত্রণা। কাজেই হাওয়ায় হুস করে বাতিটা নিবে যেতে তার এত ভাল লাগছিল।

বলতে কি, অন্ধকারটা যেন ঠাণ্ডা জল হয়ে তার ভিতরের বাজে ভাবনা চিন্তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল।

এখন শুধু একটা চিন্তা, এবং এটাই মূল চিন্তা, তার মাথার মধ্যে চমৎকার খেলা করতে লাগল। একটু বেশি জল পেলে নিবিড়তা পেলে পাঁকাল মাছ যেমন ঘুরে ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে মনের সুখে খেলা করে।

না, রমলা বলে কাউকে সে চিনত না, চেনে এক ধূর্ত মহিলাকে, ধূর্ত কামুকা, পুরুষ শিকারে যার জুড়ি নেই, স্বরূপনগর স্কুলে এখন মাস্টারী করে, এই মাত্র এ-ঘরে ঢুকেছিল, চমৎকার অভিনয় করে গেল—অভিনয়ে এতটুকু খুঁত ছিল না, হীরেন মুগ্ধ অভিভূত হয়েছে সন্দেহ কি। সত্যি, মেয়েছেলেটির গুণের শেষ নেই। হীরেন জেগে আছে অনুমান করে এখানে ছুটে এসেছিল। হয়তো টের পেয়েছিল হীরেন ঘুমোয়নি, কেননা একটু আগে হীরেন সিগারেট

খাচ্ছিল, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পাশের ঘরের মানুষের নাকে লাগা অস্বাভাবিক না। তবু হীরেন জেগে আছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক বুঝতে না পেরে এবং কেবল অনুমানের ওপর সবটা ছেড়ে না দিয়ে, নিজের চোখে এসে একবার দেখে যাওয়া ভাল, দরজার খিল এঁটে হীরেনের জোয়ান চাকরকে দিয়ে দুপুর রাতে ইচ্ছামত গা টেপানো হয়েছে, যদি সত্যি হীরেন টের পেয়ে থাকে, কাজেই একবার এসে হীরেনকে বলে যাওয়া ভাল, ভীষণ মাথা ধরেছিল—আর, আর সেই সঙ্গে ক্ষমা চাওয়া ও চোখ মোছার ঘনঘটা। চমৎকার জমেছিল অভিনয়। সবই বলা হল, অথচ সবই গোপন করা হল।

যাক, এই নিয়ে হীরেন এখন মাথা ঘামাচ্ছিল না। অভিনয় দেখে ভাল লেগেছে, ফুরিয়ে গেছে। অভিনয় দেখে আসার পর কে কবে এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। জীবনে অনেক ভাল ভাল অভিনয় হীরেনকে দেখতে হয়েছে, দেখেছে, দেখার পর ভুলে গেছে, তা না হলে নতুন আর একটা অভিনয় দেখতে গিয়ে মুগ্ধ বিস্মিত হত কেমন করে।

এখন কথা হচ্ছে হুলা। হুলা কতটা টেপাটেপি করেছিল! কেবল মাথা, কপালের দুটো রগ? আর কোথাও তার হাত যায়নি? না কি কপাল টিপতে টিপতে এক সময় হুলার হাত ঘেমে গিয়েছিল, তারপর—ছবিটা হীরেন মনে মনে কল্পনা করল।

যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে হুলা—সুন্দর মানুষটা নিজে থেকে যদি তার শরীরের একটা বিশেষ জায়গায় হুলার হাতটাকে ধরিয়ে দিয়ে থাকে, হুলার তখন তৃপ্তি না পাওয়ার সুখী না হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

এখন কথা হচ্ছে, তারপর? এই দু' বছর অনেক নরম মাংস হুলা হাতিয়েছে, তুলতুলে নরম মাংস টিপতে গিয়ে সে কম সুখ পায়নি,

তার চোখ দেখে হীরেন বুঝত। এভাবে এক একটা হাঁস মুরগিকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে ছোঁড়া আদরও কম করত না। বাহারের সব হাঁস, রংদার হৃষ্টপুষ্ট ডিম আসবে আসবে করছে, বা ডিম এসে গিয়েছে, হুলা হয়তো অনেকক্ষণ টেপাটেপি করল, মুরগিটাকে, দু'বার তিনবার চুমুও খেল, কিন্তু তারপর ?

হীরেন হাতের ঘড়িটা দেখত, অর্থাৎ কতক্ষণ হুলা জীবনটাকে নিয়ে আদর সোহাগ করবে টেপাটেপি করবে তার একটা সময় বাঁধা থাকত, সময় উতরে যাবার পর আর এক সেকেণ্ড দেরি না, হীরেন ডান হাতের একটা আঙুল তুলে ধরত, অর্থাৎ এভাবে হুলাকে সিগন্যাল দেওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে হুলা মুরগিটার গলা ছিঁড়ে ফেলত, টেনে ছেঁড়া হত, আবার অনেক সময় গলা টিপে সাবাড় করা হত।

যখন যেমন খুশি—এটা হুলার মর্জির ওপর নির্ভর করত।

কি বুকে ছুরি বসিয়ে শেষ করে দেওয়া। হাঁস মুরগি পায়রা পাখি—সুন্দর সুন্দর সব পাখি।

তেমনি ফুল গাছ। মাদার অতসী ফুল নিয়ে কম শখ আহ্লাদ করত হুলা। তারপর কুড়ুল কাটারি দিয়ে ঐ হাতে একধার থেকে কুপিয়ে সব শেষ করেছে।

কিন্তু এখানে কী হল ?

এখানেও নরম গলা ছিল, টিপে ধরার চমৎকার শ্বাসনালী ছিল। না কি হীরেন সামনে ছিল না, ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে কেউ সিগন্যাল দেয়নি, আর বেকুব সব ভুলেটুলে গেল।

সিগারেট ভাল লাগছিল না। যেন এবার তার মাথা ধরেছে। কপালের রগ দুটো দু' আঙুলে টিপে ধরে হীরেন পায়চারী করতে লাগল, তারপর এক সময় পিছনের দরজা খুলে ভিতরের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

১০

ইচ্ছা ছিল না। তবু এমন একটা অপ্রিয় কাজ তাকে করতে হল। হঠাৎ বাঘার পেটে দুম করে এক লাথি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘা লাফিয়ে উঠে বিকট গর্জন।

তারপর যা স্বাভাবিক। দুপুর রাতে কুকুরটা যখন এত জোরে চেঁচামেচি করছে, তখন একটা কিছু হয়েছে—বারান্দার দিকের দরজা খুলে দুলা ছুটে বেরিয়ে এল। পাতার ঘরে উল্লাসীও জেগে গেল। কেরাসিনের লম্ফটা জ্বেলে তাড়াতাড়ি উল্লাসী উঠোনে নেমে এসেছে।

হীরেন তাই চাইছিল। উল্লাসী জাগুক বা না জাগুক, দুলার যাতে ঘুম ভেঙে যায়, দুলা যাতে একবার তার সামনে এসে দাঁড়ায়। এই মধ্যরাত্রে দুলাকে দেখবার জন্য সে ভীষণ ছটফট করছিল। দুলার চেহারাটা দেখতে হবে। যেন অন্ধকারেই দুলার মূর্তি

দেখে একটা কিছু আঁচ করতে পারবে। অথবা মনে মনে সে যা আঁচ করে রেখেছে, হুলার মুখ দেখে সেটা সে এখন যাচাই করবে।

হুলা দু'হাতে চোখ রগড়াচ্ছিল। তা তো হবেই, কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে। অথবা অভিনয়ও হতে পারে। এতটা সময় ওই মানুষটার সঙ্গে ছিল, এক আধটু অভিনয় হয়তো এর মধ্যেই শিখে এসেছে। অর্থাৎ ওই ঘর থেকে অনেকক্ষণ হয় সে বেরিয়ে এসেছে। নিজের ঘরের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ঘটা করে চোখ রগড়ে রগড়ে হীরেনকে তাই দেখাচ্ছে ছোঁড়া।

কি হল? হীরেন ধমক লাগাল।

চোখ থেকে হাত সরিয়ে হুলা পিটপিট করে বাঘাকে দেখল। বাঘা তখনও চিল্লাচ্ছে। বাঘা এমন করছে কেন বুঝতে না পেরে হুলা আবার কর্তাবাবুকে দেখল।

ঘুম ভাঙল মহারাজের? যেন হাসতে গিয়ে হীরেন গলার স্বরটাকে বিকৃত করে তুলল।

কাজেই হুলা একটু বেশি ঘাবড়ে গেল।

আলো হাতে উল্লাসী ততক্ষণে এঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হীরেন সেদিকে ঘাড় ফেরাল।

বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, বুঝলে হুলার মা। তা তোমরা তো ঘুমোও না, সাত হাত জলের নিচে তলিয়ে যাও সব। সর্বস্ব নিয়ে গেলেও টের পেতে না।

এবার উল্লাসীও ঘাবড়ে গেল, তাছাড়া লজ্জাও যেন পেল খুব। মুখটা নিচু করে রাখল।

এই শালাও টের পায়নি। পড়ে পড়ে ঠিক ঘুমোচ্ছিল। হীরেন আর একবার বাঘার পেটে ছোট করে একটা লাথি বসাল। কাল থেকে ভাত মাংস সব বন্ধ তোর, বুঝলি বেটা। হীরেন দাঁত মুখ

খিঁচিয়ে উঠল। বাঘা নতুন করে কাঁইকুঁই করে কাঁদতে লাগল।

উল্লাসীর মতন হুলাও ঘাড় গুঁজে আছে। হীরেন এবার কটমট করে তার দিকে তাকাল।

কি হল, চুপ করে আছিস কেন।

কোন্ দিক দিয়ে ঢুকেছিল শালা? হুলা ঘাড় সোজা করল।

তা কি করে জানব। ঢুকেছিল ঠিক। আমি শব্দ পেয়েছি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

হুলা ঘাড় ঘুরিয়ে উঠোনের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

বুঝলি, হীরেন ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল, নাকে সরষে তেল দিয়ে ঘুমোলে কোন্‌দিক দিয়ে চোর ঢোকে আর কোন্‌দিক দিয়ে সব তুলে নিয়ে পালায় টের পাওয়া মুশকিল।

হুলা অস্বস্তিবোধ করছিল। বুকের পেশী টান করে দাঁড়াল। যেন চোর যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে এখনি গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হীরেনের খোঁচা দেওয়া কথা তার সহ্য হচ্ছিল না, ছোঁড়ার চেহারা দেখে হীরেন বুঝতে পারছিল। মনে মনে সে হাসল। তাহলেও গলার স্বরটা নরম করল না।

তুমি চলে যাও উল্লাসী, তুমি মেয়েছেলে—জেগে থাকলেই বা তুমি কি করতে, আমি হুলাকে বলছি, হীরেন হুলার দিকে চোখ রাখল। এমন একটা জোয়ান মরদ, দেখছি বাড়িতে ডাকাত পড়লেও দোরে খিল এঁটে তুই পড়ে পড়ে ঘুমোবি।

উল্লাসী আর দাঁড়াল না। হুলার সঙ্গে কর্তাবাবু যখন কথা বলে উল্লাসী কোন সময়েই সামনে থাকে না। আলোটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে কদমতলার দিকে চলে গেল।

হুঁ, কি হল! হীরেন আবার একটা খোঁচা দিল হুলাকে। ক'দিন থেকে দেখছি তোর তেজটেজ নিবে গেছে, যেন মেয়েছেলেরও বাড়া হয়ে গেলি, আমার তো মনে হয় চোর ডাকু এয়েছে টের পেলেও তুই

আর ঘর থেকে বেরোবি না, কেঁচোর মতন বিছানার সঙ্গে লেপটে শুয়ে থাকবি।

কে বলেছে! হুলা ফোঁস করে উঠল। যেন কর্তাবাবু তার আত্মসম্মানে ঘা দিচ্ছে আর সহ্য করা ঠিক না। আমার শিয়রের কাছে দা কুড়ুল আছে না, লোহার ডাণ্ডা রেখে শুই না?

হুলা ঘনঘন শ্বাস ফেলছিল, হীরেন দেখল অন্ধকারেও হুলার চোখ জ্বলছে।

টের পেলে আমি কখনো ঘরে শুয়ে থাকি, এক লাফে বেরিয়ে শালার মাথা দু'ফাঁক করে দিতাম। তবে কি না চোখটা লেগে গিয়েছিল, এতটা সময় নতুন ঠাকরুণের কাছে ছিলাম, বিছানাটা ঝেড়েটেড়ে দিলাম, মশারী খাটিয়ে দিলাম, ঠাকরুণের মাথা ধরেছিল, মাথাটাও টিপে দিতে হল। এই মাত্তর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছি।

হীরেন খুশি হল। এক কথাটাই হুলার মুখ থেকে শুনতে চাইছিল। নতুন ঠাকরুণ, স্বরূপনগরের মাস্টারণী। বিকেল থেকে তাই ডাকছিল হুলা। বৌদি ডাকটা তার পছন্দ হয়নি।

ও, তাই না কি! অন্ধকারে হুলার মুখের সামনে হীরেন গলাটা বাড়িয়ে দিল। তা বেশ করেছিস, বাড়ির অতিথি, আর কোন অসুবিধে টসুবিধে হয়নি তো, তাই বল, আমি আরো ভাবলাম খেয়ে উঠেই ঘরে গিয়ে তুই নাক ডাকাচ্ছিস। হীরেন সামান্য হাসল।

না না, এই তো মিনিট দশ আগে আমি শুতে গেলাম।

হুঁ, এখন বুঝলাম, সবে চোখটা লেগেছিল, আর কি, আর ঠিক ওই সময়টায় চোর শালা—হীরেনের কথা থেমে গেল। মাঝের ঘরের জানালার একটা পাল্লা খুলে গেল। হীরেন সেদিকে ঘাড় ফেরাল। এক জোড়া চোখ অন্ধকারে চকচক করছে। যেন জ্বলছে।

এক সেকেণ্ড। তারপর জানালার পাল্লাটা আবার আস্তে আস্তে

বন্ধ হয়ে গেল।

নতুন ঠাকরুণ জেগে গেছে। হুলা ফিসফিস করে উঠল!

হুঁ, বাঘা চেল্লাচেল্লি করছে, জেগে ওঠার কথাই বটে। এই শালা চুপ। হীরেন বাঘাকে ধমক লাগাল। কদমতলার ওদিকটা আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো নিবিয়ে উল্লাসী শুয়ে পড়েছে বোঝা গেল। এক নজর সেদিকে চোখ রেখে হীরেন পরে হুলার দিকে মুখ ফেরাল। যা এইবেলা শুয়ে পড়গে, একটু হুঁশ রেখে ঘুমোবি, বুঝলি। হাঁস মুরগি কত কি তুলে নিয়ে যেতে পারে, বেটারা সব সময় ওঁত পেতে আছে।

না না, আমি যতক্ষণ আছি—বীরদর্পে কর্তাবাবুকে অভয় দিয়ে হুলা তার ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকল।

হল না! নিজের ঘরে এসে হীরেন এবার নিজেকে ভেংচি কাটল। রাগে তার গা কিরকির করছিল। ঠিক আড়ি পেতে ছিল দুষ্ট। হুট করে জানালা খুলে উঁকি দিয়ে সব দেখে নিল। পাছে হুলা না বেফাঁস কিছু বলে ফেলে। তাই বুঝি সন্দেহ আক্রোশে সাপিনীর চোখ দুটো এমন জ্বলছিল। চোর আসেনি, মিছে কথা, বলে ধোঁকা দিয়ে তোকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে হুলা, সাবধান! তোর কাছ থেকে কথা আদায় করতে চাইছে তোর বাবু। যেন পারলে তখনি হুলাকে সাবধান করে দিত স্বরূপনগরের মাস্টারনী। তাকানোটা ঠিক সেরকম ছিল না?

না কি সত্যি অনুতাপের জ্বালা নিয়ে রমলা তখনও বসে বসে কাঁদছিল! জল ছিল তাই অন্ধকারে দু'চোখ এমন চকচক করছিল?

হীরেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার আগের বিশ্বাসই ঠিক। মাথা ধরা-টরা কিছু না। হুলাকে দিয়ে গা টিপিয়েছে। টিপতে টিপতে হুলার হাত যখন একসময় থেমে গেছে তখন হয়তো

আরো কোন খেলা খেলেছে ঐ নচ্ছার মেয়েমানুষ।

রাগে ফেটে পড়ছিল হীরেন। খামকা বাঘার পেটে দুটো লাথি মারা হল। কাজ ছিল না কিছু। কতক্ষণে রাত পোহাবে অধৈর্য হয়ে সে অপেক্ষা করছিল। হুলা কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না। রাত দুটো পর্যন্ত ওই ঘরে থেকে নতুন ঠাকরুণের কতটা সেবাযত্ন করেছিল ছোঁড়া হীরেনকে জানতে হবে। বাজে মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছে, সত্য কথা সহজে বলতে চাইবে না ঠিকই। তাহলেও হীরেনকে চেষ্টা করতে হবে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বেঁকিয়ে ঘি বার করতে হবে, উপায় কি?

১১

রাত্রে তেমন ঘুম হয়নি, অথচ কাকভোরে তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে।

চোখ করকর করছিল, পায়ের রগে টান ধরেছিল, তাহলেও হুলার উৎসাহ কত, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ভিতরে সাংঘাতিক একটা ফুর্তি নিয়ে উত্তেজনা নিয়ে আবার সে মাঠ ভাঙছে। রসুলপুর ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে এত বড় একটা পুঁটলি। পুঁটলিটা কখনো মাথায় রাখছে, কখনো বগলে নিয়ে হাঁটছে। হাঁটছে, আবার এক এক সময় দৌড়োচ্ছে। যেন দেরী হয়ে গেল, সূর্য আকাশের অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল না?

সকাল সকাল বাড়ি না ফিরলে কর্তাবাবু রাগ করবে, মেলা কাজ পড়ে আছে ওদিকে। কর্তাবাবুর মতন হাতে ঘড়ি নেই তার, তাহলে বুঝতে পারত বেলা এখন ক'টা বাজে।

এখন তো তবু কপালে রোদ লাগছে বলে তেমন ছুটতে পারছে না, কিন্তু যখন স্বরূপনগর যায়, তখন ঠাণ্ডা হাওয়া ছিল পাখি ডাকছিল, পূব আকাশ সবে রক্তকমলের রং ধরেছিল। অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগেই বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়েছিল।

না, স্বরূপনগর পৌঁছে সে দেরি করেনি।

তালা খুলে নতুন ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে, যেমন যেমন তিনি বলে দিয়েছিলেন, বাক্স থেকে শাড়ি সায়া ব্লাউজ বের করে সব একসঙ্গে সুন্দর করে ভাঁজ করে একটা পুঁটলি করে নিয়েছে।

বাক্সের চাবিও ঠাকরুণ দিয়ে দিয়েছিলেন। আবার সব বন্ধ-টন্ধ করে গুছিয়ে জায়গামত রেখে এসেছে সে।

সত্যি, মানুষটা দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি গোছালো। এত ভাল লাগছিল তার ঘরের ভিতরটা, কেমন পরিষ্কার ধবধবে বিছানা, ছোট একটা টেবিল, কী সুন্দর করে সাজানো, আরসি চিরুনি পাউডারের কৌটো আলতার শিশি—ওদিকে জলের কুঁজো গ্লাস, একলা মানুষ, ক'খানা আর থালা বাসন—ছবির মতন লাগছিল, এমন চমৎকার করে সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা কাজ করেছে হুলা। অবশ্য নতুন ঠাকরুণ কথাটা শুনলে হাসবে, তবে কি না কর্তাবাবু শুনলে ঠিক রেগে যাবে। তা হলেও তেমন কিছু অপরাধ না এটা তার। মনে হয় না খুব একটা দোষের কাজ করে এসেছে সে ওখানে।

নতুন ঠাকরুণের চিরুনিটা সুন্দর। হাতে নিয়ে সে নেড়েচেড়ে দেখছিল। তারপর ঐ চিরুনি দিয়ে মাথাটা বেশ করে আঁচড়াল, কেমন লোভ হচ্ছিল ওটা দিয়ে চুল আঁচড়াবার। চিরুনিটা থেকে এমন একটা সুগন্ধ বেরোচ্ছিল!

আঁচড়াবার সময় তার মনে হচ্ছিল এই সুগন্ধ তার চুলেও লেগে থাকবে। তা অবশ্য লেগে থাকেনি। এই তো, মাঠের ওপর দিয়ে

চলতে চলতে দু'বার একবার চুলে আঙুল ঘষে আঙুলটা সে শুঁকে দেখেছে। গন্ধটা আছে, তবে এত সামান্য, টের পাওয়া যায় না।

কাল রাত্রে নতুন ঠাকরুণের মাথাটা যখন টিপছিল এই গন্ধ তার নাকে লেগেছিল। বলতে কি, এই জন্যই একটু আগে ছোট টেবিলের ওপর আরশির পাশে শুইয়ে রাখা চিরুনিটা হাতে নিতে গন্ধটা মনে পড়ে তার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠেছিল।

যাই হোক, রাস্তায় বেরিয়ে মাথার চুল আবার হাত দিয়ে নেড়ে এলোমেলো করে ফেলেছে সে। দরকার কি। রসুলপুর ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে ফেলত শাড়ি ব্লাউজ আনতে গিয়ে ওঘরের আরশি চিরুনি এটা ওটা নাড়াচাড়া করেছিল সে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও সে যায়নি। কেননা আজ কেনাকাটার কিছু ছিল না। তবে রেবতীর চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খেতে হয়েছে। স্বরূপনগর এলাম অথচ একবার ওখানে উঁকি দিলাম না, কেমন যেন খুঁতখুঁত করছিল ভিতরটা, হুঁ চায়ের নেশা যদিও—তাছাড়া সকালে কিছু মুখে না দিয়ে তাকে এতটা রাস্তা ছুটতে হয়েছিল, বেশ খিদেও পেয়েছিল।

এক কাপ চা ও একটা বিস্কুট খেয়েছে। পয়সা? খুবই গোপন রাখার মতন ব্যাপারটা। কর্তাবাবু শুনলে ভীষণ রেগে যাবে।

আসলে নতুন ঠাকরুণ চাবির ছড়াটা যখন তার হাতে তুলে দেয় সেই সঙ্গে ক'টা পয়সাও তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল, বলেছিল, রাস্তায় কিছু কিনে-টিনে খাস। কাজেই রেবতীর দোকানে ঢুঁ মারার কোন অসুবিধা ছিল না।

কিন্তু অন্য দিনের মতন খামকা সে সেখানে দেরি করেনি। অন্যদিন চা খেতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় দোকানে বসে থাকে। কেন জানি ভাল লাগে, রাস্তার ওপর দোকান। গাড়ি ঘোড়া লোকজন যাওয়া আসা করছে দেখা যায়। আর মেয়েগুলি যখন

দল বেঁধে বইখাতা বগলে ইস্কুলে যায়। কতরকম কাপড় পরার ঢং। ডবকা ডবকা ছুঁড়ি। সকালে ইস্কুল। আজও হুলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

কিন্তু আজ যেন আর তেমন মন দিয়ে একটা মেয়েকেও তার দেখতে ইচ্ছা করছিল না।

হুঁ, কত বয়স হয়েছে মানুষটার, নতুন ঠাকরুণের, তাদের রসুলপুরের বাড়িতে যে অতিথি হয়েছে? অনেক বয়েস হল, কিন্তু হুলার মনে হচ্ছিল বেশী ঝুলিয়ে ঢং করে কাপড় পরে যে ক'টা মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছিল তাদের সব ক'টার চেয়ে ঐ মানুষটি সুন্দর, এখনও, অল্পবয়স হলে হবে কি, পাশে দাঁড় করালে মনে হবে, একটা মেয়েও তাঁর পায়ের যুগ্যি না।

যেমন নাক চোখ তেমনি গায়ের রং মাথার চুল—আর শরীরের গড়ন। গড়নটা কেমন ভাবতে গিয়ে সরল সিধা মাথা উঁচু পলাশ গাছটার ছবি তার মনে পড়ে গেল। ফাল্গুন মাস আরম্ভ হতে নতুন পাতার ঝলমল ও দগদগে আগুনের টুকরোর মতন অসংখ্য ফুল ফুটে গাছটা রাণীর মতন সেজে থাকত।

হুঁ, বাড়ির পূব দক্ষিণ কোণায় ছিল ওই গাছ। কুড়ুল দিয়ে গত বছর কুপিয়ে হুলা ওটাকে শেষ করেছে। যাই হোক, সেই রাণীর মতন লম্বা চওড়া ছিমছাম গড়ন এই নতুন ঠাকরুণের, বসন্তের পলাশ গাছের মতন রূপ!

যদি কেউ বলে, এই সুন্দর মানুষটাকেও কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে তুই শেষ করতে পারবি? যেমন অত সেজেগুজে থাকা পলাশ গাছটাকে শেষ করেছিলি?

হুলা তখন কী উত্তর দেবে? হাসবে। বলবে, কুড়ুলটা তাঁর পায়ের কাছে রেখে দেব, তারপর হুমড়ি খেয়ে ওই ফরসা সুন্দর পায়ে কপালটা ঠেকিয়ে বলব, আমি জন্মে জন্মে তোমার চাকর

হয়ে থাকব, তোমার সেবা করে ধন্যি হব।

না, স্বরূপনগরে রেবতীর চায়ের দোকানে মোটে পাঁচ মিনিট আজ বসেছিল, এক কাপ চা খেতে যতটা সময় লাগে, তারপর ছুট, রসুলপুরে তাকে টানছিল, একটি মানুষ তাকে টানছিল, ফুল ফোটার দিন থেকে আরম্ভ করে পলাশ গাছটা যেমন ভোমরার ঝাঁককে টানত, এখানে আর ভোমরার ঝাঁক নেই, একটা ভোমরা, একজন হুলা।

নিজেকে ভোমরার সঙ্গে তুলনা করে নিজের মনে সে হাসল।

নিরালা মাঠ, মাঠ কোণাকুণি সে ছুটছে, রেবতীর চায়ের দোকানে বসে থাকতে রাস্তায় গাছের মাথায় বাড়ির চালে রৌদ্রের রং ছিল কাঁচা হলুদের, এখন ক্রমেই বেলা চড়ছে, এখন মাঠ জুড়ে ঝকঝকে সাদা রোদ। যেন রৌদ্রের মরুভূমির ওপর দিয়ে সে ছুটছে।

নিরালা মাঠ পেয়েই সে একটা অদ্ভুত কাজ করে ফেলল। শাড়ি শায়ার পুঁটলিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকল। অবিকল সেই চিরুনির গায়ের গন্ধ, অবিকল কাল রাত্রের গন্ধ, মাথা টেপার পর তার আঙুলে যেটুকু লেগে ছিল।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আঙুলটা নাকের কাছে রেখে গন্ধটা শুঁকতে আরম্ভ করেছিল সে, ঠিক তখনই তার চোখ লেগে যায়, ঠিক তখনই বাইরে বাঘা চেঁচিয়ে ওঠে। বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। দরজা খুলে বেরিয়ে দেখে অন্ধকার বারান্দায় কর্তাবাবু দাঁড়িয়ে। কাজেই কাল রাত্রে এক সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটেছিল। চোর ঢুকেছিল আবার ওদিকে কর্তাবাবুর ঘরে একটি নতুন মানুষ শুয়েছিল। মনে রাখার মতন একটা রাত গেছে কাল।

১২

বেশ সকাল সকাল ফিরে এসেছিল। কর্তাবাবু খুশি। চোখ বড় করে হুলাকে দেখছিল। হুলার কপালে ঘামের ফুটকি।

আমার মনে হয় ও দৌড়ে গেছে, আবার দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরে এসেছে। মুক্তার মতন সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি বের করে নতুন ঠাকরুণ হাসছিল।

দু'জনই কদমতলায় দাঁড়িয়ে। কর্তাবাবুর পায়ের কাছে এত বড় একটা কাতলা মাছ। হুলার চোখ বড় হয়ে গেল। যেন পুকুরের সবচেয়ে পুরনো সবচেয়ে বড় মাছটা জেলেরা আজ জাল দিয়ে ধরে ফেলেছে, তারপর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

তা তো হবেই। কর্তাবাবু যেমন ওদের বলে দিয়েছে। বাড়িতে অতিথি এসেছে। বড় মাছ ছাড়া চলবে কেন।

বুঝলি। হীরেন আঙুল দিয়ে পায়ের কাছে ঝকঝকে বঁটিটা

দেখাল। তোর অপেক্ষায় আছি সবাই। তুই ছাড়া এতবড় মাছ কাটাকুটি করবে কে।

আহা, বেচারা এত ছুটে এসেছে, একটু জিরিয়ে নিক। রমলা হুলার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। দাও, ওটা আমার হাতে দাও।

শাড়ি শায়ার পুঁটলি ও চাবির ছড়া দুটোই একসঙ্গে হুলা নতুন ঠাকরুণের হাতে তুলে দিল।

তুমি এই বেলা চানটা সেরে ফেল, হীরেন রমলার চোখে চোখ রেখে হাসিমুখে বলল, ওখানে নিশ্চয়ই সকালে চান করা অভ্যেস ?

রমলা ঘাড় নাড়ল।

মর্নিং ইস্কুল, কাজেই ওটা একবারে সেরে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়।

উল্লাসী তোমার স্নানের জল তুলে রেখেছে। হীরেন আঙুল দিয়ে উঠোনের এক পাশে বাখারীর বেড়া দেওয়া স্নানের জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

রমলা আগে ঘরে গেল। পুঁটলি খুলে শাড়ি জামা বের করে তোয়ালে ও সাবান হাতে আবার বেরিয়ে এল।

নে নে, এইবেলা কাজে লেগে যা। হুলা কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপাল ঘাড় মুছেটুছে নিয়ে কাজে হাত লাগাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, দেখে হীরেন খুশি হল। মাছটা আগে ধরে ফেল, আজ অনেক কাটাকুটি আছে, তারপর মুরগি কাটতে হবে। আজ ডবল মুরগি জবাই হবে। কথা শেষ করে হীরেন শব্দ করে হাসল।

হুলা একটু অবাক, তেমনি খুশিও হল। পালের সেরা এত বড় দুটো মোরগ ধরে এনে হীরেন কদমগাছের গুঁড়ির সঙ্গে

বেঁধে রেখেছে।

মাছ মাংস দুটোই হবে? দুলা বঁটিটা তুলে নিয়ে বঁটির পেটে আঙুল ঘষে ধার পরীক্ষা করছিল।

হুঁ, বাড়িতে অতিথি এসেছে, মাছ মাংস সবই রান্না হবে, উল্লাসীকে আমি বলে দিয়েছি—হীরেন রান্নাঘরের দিকে চোখ ফেরাল। তোমার বাটনা বাটা হয়ে গেছে দুলার মা?

হয়ে এসেছে। ওঘর থেকে মৃদু গলায় দুলার মা জবাব দিল। তখনও শিলনোড়ার শব্দ হচ্ছিল।

মা বেটি ভয়ানক ফাঁপরে পড়েছে আজ, দুলা দাঁত বের করে হাসল। এত রান্না ঘাড়ে পড়েছে।

বাড়িতে লোকজন এলে করতেই হবে, উপায় কি—একটু থেমে হীরেন আবার বলল, তা বলে তোর মা অখুশি নয়, তোর যেমন কাটাকুটিতে আনন্দ তেমনি উল্লাসীও দু পদ বেশি রাঁধতে পারলে বেঁচে যায়—হীরেন রান্নাঘরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কেমন, তাই না দুলার মা! দাঁত ছড়িয়ে শব্দ না করে হীরেন হাসলও একটু।

কিন্তু ওদিক থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, শিলনোড়ার শব্দটাও হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।

মনে হয় তোর মা এই বেলা আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছে, বাটনা হয়ে গেছে। দুলার দিকে চোখ নামিয়ে হীরেন বিড়বিড় করে উঠল। দুলা ততক্ষণে বঁটি দিয়ে মাছের মুড়ো আলগা করতে লেগে গেছে।

শব্দ আসছিল ওদিক থেকে। বাখারীর বেড়া দেওয়া স্নানের জায়গা থেকে। স্বরূপনগরের মাস্টারনী প্রাণ ভরে গায়ে মাথায় কুয়োর ঠাণ্ডা জল ঢালছে। জলের ছপছপ শব্দ কানে আসতে হীরেন একবার সেদিকে ঘাড় ফেরাল। গা মাথা ঠাণ্ডা করছে

রমলা।

তা তো করবেই। কাল রাত থেকে, না কি দুপুরের পর এখানে রিক্সা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে গা মাথা গরম হয়ে আছে। মনে মনে হীরেন হাসল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আড়ালে দাঁত ঘষল।

হুলা তার এসব কিছুই দেখল না। মাছের তাজা রক্তে তার দুহাত লাল হয়ে গেছে। মাথাটা আলগা করে নামানো হয়েছে। এবার পেট কাটা হচ্ছে।

আশ্চর্য, হুলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আছে। অন্যদিন এসব কাটাকুটি করতে বসে তার মুখ থেকে কথার ফোয়ারা ছোটে। চোখ দুটো আহ্লাদে উত্তেজনায় নাচতে থাকে। কিন্তু এখন চুপ। কিছু ভাবছিল কি ছোঁড়া! হীরেন বুঝতে পারছিল না। একটা ভাবনা এসে উল্লাসীর ছেলেকে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

একটু আগে মাঠ কোণাকুণি শাড়ি-শায়ার পুঁটলি নিয়ে যখন সে ছুটে আসছিল, মাঠময় ছড়ানো চৈত্র রোদের মতন তার সারা মুখে চোখে হাসি ঝকমক করছিল। এখন কিনা মুখটা মেঘলা আকাশ হয়ে গেল।

তাই তো, আঙুলে হাতের তেলোয় কাতলা মাছের টলটলে রক্ত দেখে তার নাকের ডগাটাও কুঁচকে আছে। ভয় না ঘেন্না না। তবে কি এত কালের পুরনো মাছটার জন্য দুঃখ। যাকে বলে মনোকষ্ট। না, তা-ও না।

তার যেন মনে হচ্ছিল হাতটা নোংরা হয়ে গেল, আঙুল ক'টা রক্তে মাখামাখি হয়ে বিশ্রী ছোপ ধরল।

হুঁ, তার এই হাত, এই আঙুল। কাল রাত্রে সে আরো অনেক বেশি ভাল কাজ করেছে, সুন্দর কাজ করেছে এই হাত দিয়ে।

নতুন ঠাকরুণের চাঁদের ফালির মতন ছিমছাম ফরসা কপালটা

সে টিপে দিয়েছিল।

না, কর্তাবাবু জানল না তার মনের কথা। বিষণ্ন হয়ে হুলা চিন্তা করেছে, কাল রাত্রে তার হাতটা স্বর্গের একটা সিঁড়ি ধরে রেখেছিল, আজ, এই মুহূর্তে হাতটা পাতালের অন্ধকারে নেমে এসেছে। অর্থাৎ তেমনি একটা অস্বস্তি নিয়ে কিশোর ভুগছিল। পাতালের নোংরা ঘাটাঘাটি করছে সে।

ও কি, তোর হাত চলছে না কেন? হীরেন রুষ্ট হল। সেরে ফেল্ সেরে ফেল্—হুঁ, গাদার মাছ আলাদা করে দে, ভাজা হবে, পেটের মাছ দিয়ে কালিয়া—হুলার মা, তুমি এদিকে এসে দেখে যাও।

উল্লাসী বেরিয়ে আসতে হীরেন কাটা মাছের টুকরো তার হাতের বাসনে তুলে দেয়। হীরেনের হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। কৈ, হীরেন তো মন খারাপ করছে না। বরং চোখের মণি চকচকে হয়ে উঠেছে। যেন অন্যদিনের চেয়েও সে বেশি খুশি।

তেমনি মুরগি কাটতে বসে হুলা কর্তাবাবুর ধমক খেল। একবার না, তিনবার।

এতটা রাস্তা ছুটে গেছে, তখুনি আবার ফিরে এসেছে। পরিশ্রম হয়েছে। রমলা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। স্নান শেষ। প্রসাধন সেরে ঘর থেকে বেরিয়েছে।

আবার সেই ফুলে ফুলে রাঙ্গা মাথা উঁচু চমৎকার পলাশ গাছটাকে মনে পড়ল হুলার। ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁ করে সুন্দর মানুষটাকে দেখছিল। তার হাতের মুরগি চিৎকার করে ডানার ঝাপটা মেরে ছিটকে প্রায় বেরিয়ে যায়। ধারালো চকচকে ছোরাটা হীরেন হুলার নাকের সামনে বাড়িয়ে দেয়।

উঁহু, আজ আর টেনে গলা ছেঁড়া তোর কম্ম না বেকুফ, হীরেন আগের চেয়েও বড় করে ভেংচি কাটল। নে, এটা ধর, এটা দিয়ে

গলা আলগা কর। হুলার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে হীরেন একদলা থুথু ফেলল। মনে হয় যেন তোর হাতে বাত নেমেছে, জোয়ান তাগড়া ছেলে না, আশী বছরের থুত্থুড়ে বুড়ো?

ধমক খেয়ে দাঁত খিঁচুনি দেখে হুলা শেষ পর্যন্ত মুরগির গলা কাটল। মাথাটা কদমগাছের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটছিল। গলটা টিপে ধরে ধড়টা বাঁ-হাতে একটু সময় ঝুলিয়ে রাখল, যাতে আর এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে না পড়ে।

কাটা মাথাটা নিয়ে কাকের দল হুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে, বাঘা ছুটে এসে লকলকে জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে ঘনঘন লেজ নাড়ছে, ঠুকছে। হীরেন খুসি হল। রমলা কাছে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে।

নে, এইবেলা এটাকে শেষ কর। বাঁধন খুলে দু' নম্বর মুরগিটা হুলার দিকে ঠেলে দিয়ে হীরেন রমলার দিকে তাকাল।

কেমন লাগছে জায়গাটা?

খুব ভাল। রমলা হাসল। হাসলে এখনো তার গালে টোল পড়ে। ভাবছি হাতের কাজ শেষ হলে হুলাকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখব।

হুঁ, হীরেন মাথা নাড়ল। তা তো দেখবেই। হুলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গোটা গাঁ খানাই তোমায় দেখিয়ে আনবে, পারবিনা হুলা?

হুলার থমথমে চেহারায় হাসির রোদ ফুটল।

খুব পারব। ওদিকে চাঁপাতলার হাট, আর পূবে খাল, নতুন ঠাকরুণকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনব।

অন্তত দিন সাতেক এখানে থেকে যাও। হীরেন দেখছিল, নষ্ট মেয়েছেলে কেমন পুরু করে চোখে কাজল বুলিয়েছে, ঠোঁট লাল করেছে। হুলা হাঁ করে তাকিয়ে এসবই দেখছে না? আজ হুলাকে দিয়ে খোঁপায় গুঁজতে কোন্ ফুল তুলে আনবে মায়াবিনী, হীরেন তা-ও চিন্তা করল। দাঁতে দাঁত ঘষল সে। অবশ্য সেই সঙ্গে মুখের

ভদ্র হাসিটাও বজায় রাখল। ধূর্ত না হলে ধূর্তের সঙ্গে পেরে উঠবে কেমন করে। দিন সাতেক থেকে যাও, চমৎকার মসৃণ গলায় সে শিক্ষয়িত্রীকে বোঝাল। শরীরটা রেস্ট পাবে, খোলা হাওয়া টাটকা মাছ দুধ—দেখবে চেহারাটাও একটু ভাল হয়েছে।

কী হবে চেহারা ভাল করে! রমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল! কদমগাছের দিকে চোখটা তুলে দিয়ে চুপ করে রইল। অর্থাৎ এমন একটা ভাণ করল, যেন এই চেহারার ওপর এই দেহের ওপর কোন মায়া নেই আর, এই চেহারা এই শরীর নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারলে সে সুখী।

অভিনয় অভিনয়! হীরেন নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল। চেহারার ওপর মায়া নেই বলেই এত কাজল কুঙ্কুম পাউডারের ঘটা।

হয়ে গেছে হুলা? হীরেন হুলাকে দেখল। হুলা ঘাড় কাত করল। মুরগি ছোলা হয়ে গেছে। এবার ধুয়েটুয়ে পরিষ্কার করে উল্লাসীকে দিয়ে দে। বেলা কম হয়নি। আর একটা উনুন ধরিয়ে মাংসটাও চাপিয়ে দিক।

থাকব, এখন না। গাছের দিক থেকে রমলা চোখ নামিয়ে হীরেনের দিকে তাকাল। এখন স্কুলে ছুটি নেবার অসুবিধে আছে। ইচ্ছে আছে সামার ভেকেশনটা এখানে এসে থাকব। এক মাস ছুটি।

তবে তো ভালই হয়, খুব ভাল হয়। হীরেন হুলাকে দেখল। কি বলিস হুলা।

আহ্লাদে হুলা প্রায় কথাই বলতে পারল না। হাসি হাসি চোখে একবার কর্তাবাবুকে, বাকি সবটা সময় নতুন ঠাকরুণকে দেখছিল। তার জিভে কতটা জল এল হীরেন অনুমান করতে পারছিল।

১৩

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে রোদ প্রায় গাছের মাথায় উঠল। তার আগে নতুন ঠাকরুণকে নিয়ে গাছের ছায়া ধরে ধরে হুলা একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে এনেছে। আবার বিকেল পড়তে রোদের তেজ কমে গেলে বেরেনো হবে। তখন অনেক দূর তারা চলে যাবে।

হুলা বলছিল, রসুলপুর এসে খাল না দেখলে রসুলপুরের কিছুই দেখা হল না।

রমলা খুশি হয়ে ঘাড় কাত করেছিল। একটু বেশি হাঁটতে হবে? তাতে কিছু না। ফিরতে রাত হতে পারে? হোক না। তার জন্য ভয় কি। এমন একটা জোয়ান মরদ সঙ্গে থাকলে রাত দুপুর করে বাড়ি ফিরতে সে গ্রাহ্য করবে নাকি।

শুনে হুলা কম খুশি হয়নি। গর্বে তার বুকটা ভরে উঠেছিল।

কিন্তু বেলা পড়তে সে ছটফট করছিল।

রোদের তেজ কমে এল। রোদের কমলা রং ধরল। অথচ সেই যে খেয়ে উঠে নতুন ঠাকরুণ বিছানায় কাত হয়ে বিশ্রাম করছিল, আশ্চর্য, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে তো একটানা ঘুমোচ্ছে মানুষটা।

একবার পা টিপে জানালার কাছে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখেও এসেছে হুলা। ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় নি। তা ছাড়া দরজাটা ভিতর থেকে ভেজানো।

কিন্তু তা হলেও দরজার কড়া ধরে সে নাড়া দিত। শব্দ শুনে নতুন ঠাকরুণ যদি জেগে উঠত। কিন্তু এভাবে ঘুম ভাঙ্গাতে কেমন যেন তার লাগছিল।

কাজেই মন খারাপ করে কদমগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে হুলা খালের স্বপ্ন দেখছিল। এখন লাল রোদ লেগে খালের জল কেমন টলটল করছে। নৌকো ভাসছে। পানকৌড়ি ডুব দিয়েছে, ঝিরঝিরে বাতাস বইছে—

হুঁ, হুলা ভাবছিল, খালধারের নরম ঘাসের ওপর দিয়ে নতুন ঠাকরুণকে নিয়ে সে হাঁটছে, নতুন ঠাকরুণের হলুদ শাড়ির আঁচলটা বিকেলী হাওয়ায় নিশানের মতন উড়ছে, মাথার চুল এলোমেলো হয়ে কপালে নাকে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, চুলের যন্ত্রণায় শাড়ির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে নতুন ঠাকরুণ হি-হি করে হাসছে, মুক্তোর মতন সাদা দাঁতের ঝলক ·

সুন্দর এক একটা ছবি। স্বপ্ন দেখার মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে এসব চিন্তা করছিল, ঠিক তখন কর্তাবাবুও খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিল, পা টিপে এক সময় হুলার কাছে এসে দাঁড়াল।

তোর সঙ্গে কথা আছে।

হুলা চমকে উঠল। মুখটা যেন থমথম করছে হীরেনের।

হাটে যেতে হবে! স্বরূপনগর যেতে হবে? বাবুর চোখে চোখ রেখে হুলা প্রশ্ন করল।

না। হীরেন মাথা নাড়ল। এদিকে আয়। যেন কথাটা উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে বাধা আছে।

হুলাকে নিয়ে হীরেন গোয়াল ঘরের পিছনে ডুমুর ঝোপের কাছে চলে এল। হুলা ঢোক গিলতে পারছিল না, যেন সহজভাবে শ্বাস ফেলতেও তার অসুবিধে হচ্ছিল। বুঝতে পারছিল ভয়ানক গোপনীয় একটা বিষয় বলতে কর্তাবাবু তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল।

হুলার বুকের মধ্যে ঢুপ ঢুপ্ শব্দ হচ্ছিল। কেন না ডুমুর ঝোপের কাছে এসে হীরেন চুপ করে আছে। অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে আছে। তবে একটা কথা হুলার মনে আছে। মাছ মুরগি কেটেকুটে কুয়োতলায় গিয়ে যখন সে হাত মুখ ধুচ্ছিল, কর্তাবাবুও সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অবশ্য কর্তাবাবুর মুখটা তখন হাসি হাসি ছিল। বলছিল, এবেলার মতন হয়ে গেল, ওবেলা আবার হুলাকে ডাকাডাকি করতে হবে। আবার তার হাতে রক্ত লাগবে, হয়তো কপালে থুতনিতেও রক্তের ছিটা লাগবে।

কর্তাবাবুর হাসি দেখে কথা শুনে হুলাও হাসছিল। অর্থাৎ সে ধরে নিয়েছিল, বিকেলে আবার হয়তো মাছটাছ আসবে, কি এবেলা মুরগি রান্না হচ্ছে, ওবেলা কবুতর কাটা হবে। কাজেই খুব একটা অবাক না হয়ে রগড়ে রগড়ে জল দিয়ে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলছিল।

বাবু! হুলা এমন ভয়ে ভয়ে ডাকল। আমায় কিছু করতে হবে?

হুঁ। ডুমুর ঝোপের ভিতর একটা বাবুই বাসা বেঁধেছে। যেন মনোযোগ দিয়ে হীরেন বাসাটা দেখছিল। হুলার ডাক শুনে চোখ ফেরাল। করতে হবে বৈকি, তবে তেমন কিছু শক্ত কাজ না।

হীরেন এবার হাসল।

হুলা নিশ্চিন্ত হল। এতক্ষণ যেমন একটা চেহারা করে রেখেছিল বাবু।

সহজ, তোর পক্ষে কাজটা খুবই সহজ। ঠোঁটের হাসিটা আর একটু ছড়িয়ে দিল হীরেন। বুঝলি না, এতকাল তোকে শেখালাম কি, অনেক কাটাকুটি করেছিস ঐ হাতে দিয়ে, তাই না ?

হুলা চুপ। আবার তার বুকের ভিতর ঢুপ্‌ঢুপ্‌ শব্দ হচ্ছিল। হাসছিল কর্তাবাবু। কিন্তু হাসিটা অন্যরকম লাগছিল। মুখ শুকনো করে সে হীরেনের চোখ দুটো দেখল।

সহজ কাজ, তোর পক্ষে কিছুই না। হুলার মুখের কাছে মুখটা নামিয়ে হীরেন অত্যন্ত সংক্ষেপে সহজ গলায় কথাটা বলে শেষ করল। এবং কেমন করে কাজটা করতে হবে তাও সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল। বুঝলি একটুও কঠিন না, একটুও কঠিন না।

হীরেন কী আশা করেছিল ? হুলার বুকের ছাতি ফুলে উঠবে, কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে উঠবে, চোখে রক্তের ছিটা লাগবে। কাটা-কুটির কথা শুনলে রোজ যা হয় ?

কিন্তু দেখা গেল কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ছোঁড়া। মুখটা মাটির দিকে নামাল।

কি হল, চুপ করে আছিস যে ? হীরেনের চোখের মণি ছুঁচলো হয়ে উঠল। ঐ তামাক কাটার দা দিয়েই চমৎকার কাজ হবে— ছোট অথচ ভয়ানক ধার।

না না, আমি পারব না কর্তা। হুলা সজোরে মাথা নাড়ল। যেন তার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল, দাঁড়াতে পারছিল না, ধুপ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

এই উল্লুক, পারবি না মানে ? পারতেই হবে—হীরেন চোখ লাল করে উঠল। চাকর তুই, যেমন বলব করতে হবে।

হুলা দু হাতে মুখ ঢাকল।

একটুও কঠিন না, এই হাতে অনেক কিছু কাটতে হয়েছে তোকে, গলার সুরটা নরম করে হীরেন আবার বোঝাল। আজ রাত্তিরেও তোকে মাথা টিপতে ডাকবে, হুঁ, ডাকবেই, কাপড়ের তলায় করে ওটা নিয়ে যাবি, ছোট, কিন্তু ভয়ানক ধার, খাটের তলায় লুকিয়ে রাখবি, বাস্, তারপর তোর আদুরে হাতের টেপা খেয়ে খেয়ে আরামে যখন চোখ বুজবে, তখন—

শুনতে শুনতে হুলা শিউরে উঠল। তার মনে হল এতকাল যত রক্তপাত ঘটিয়েছে, হাঁস মুরগি পায়রা মাছ কাঠবিড়াল কুকুর—সব রক্ত এক সঙ্গে তার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। কাঁদতে লাগল সে। ভয় পেয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

কি হল, হুলা। হীরেন গর্জন করে উঠল।

আমি পারব না, এমন ভাল মানুষ, এমন সুন্দর মানুষ—!

সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে হীরেন হাসল।

বাইরেটা সুন্দর, ওপরটা ভাল, ভয়ানক দুষ্টু, শয়তান, কলকাতা শহরে ছিল, আমি চিনতাম, একটা রক্ত চোষা ডাইনী, অনেক রক্ত চুষে খেয়ে তারপর এখানে এসেছে।

হুলা নীরব।

কাজেই এই জিনিস কাটতে অসুবিধে নেই, আপত্তি করতে নেই, তার চেয়ে ঢের সুন্দর জিনিস ভাল জিনিস কেটে তুই হাত পাকিয়েছিস। কত পাখি কত ফুলের গাছ—

আমি পারব না কর্তা, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় মাফ করুন। যেন হীরেনের পা ধরতে হুলা হাত বাড়িয়ে দিল।

ঝটকা দিয়ে হীরেন পা সরিয়ে নিল।

ছাড়াছাড়ি নেই, মাফ করার কিছু নেই, যা বলছি করতে হবে।

এ যে নরহত্যা হবে কর্তা—

কিচ্ছু না, একটা বেশ্যা খুন করলে পাপ হবে না।, আমি বলছি।

তবু হুলা পাথর হয়ে রইল। দু'হাতে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বললাম তো, খুব সহজ, আমার বাড়িতে এসেছে, আমার ঘরে এসেছে দুষ্টু। রাত্রে তোকে ডাকবে, আজ কেবল মাথা না কপাল না, গা টেপাবে, পা টেপাবে, খুব করে টিপবি, তারপর আরামে যখন দু চোখ বুজে আসবে, তখন আগেই ওটা খাটের তলায় লুকিয়ে রাখবি, ছোট, কিন্তু চমৎকার ধার, কোপ বসালেই—

আমি পারব না। কাঁপতে কাঁপতে হুলা উঠে দাঁড়াল। জলে ভিজে ওঠা কুকুরের মতন অসহায় শীর্ণ করুণ দেখাচ্ছিল এতবড় জোয়ান ছেলেকে, যেন এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা শক্ত ব্যারাম থেকে উঠেছে সে, চোখ দুটো বসে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে, যেন এখনি এখান থেকে পালিয়ে যাবে, পালিয়ে বাঁচতে চাইছে উল্লাসীর ছেলে।

কিন্তু হীরেন তা হতে দেবে কেন। পথ রুখে দাঁড়াল।

না পারলে কি হবে জানিস, দাঁতে দাঁত ঘষল হীরেন, চোয়াল শক্ত করে ফেলল। এই ভিটে ছেড়ে তোকে চলে যেতে হবে, তোর মাকে চলে যেতে হবে, লাথি মেরে পাতার ঘর গুঁড়িয়ে দেব, তারপর গাছ তলায় থাকতে হবে।

তাই দিও গো কর্তা, তাই দাও, মা বেটিকে নিয়ে আমি গাছ-তলায় থাকব—

তা-ও থাকতে দেব না কুকুরের বাচ্চা। প্রচণ্ড জোরে হীরেন হুলার পেটে লাথি বসাল।

টাল সামলাতে পারল না হুলা। আহত পশুর মতন গোঁ গোঁ করে ঝোপের পিছনে ডোবার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল।

হীরেন আর দাঁড়াল না। অন্ধকার হয়ে গেছে।

তারপর অনেক রাত হল। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলছিল। হাওয়াও ছিল প্রচুর। আহত পশু এক সময় আস্তে আস্তে পাঁক থেকে উঠে এল। যেন তার ঘা খাওয়া সম্মান এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যেন আকাশময় ছড়ানো আগুন দেখে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। অথবা আকাশ থেকে এত এত আগুন ধার পেয়ে তার ঠাণ্ডা রক্ত গরম হয়ে উঠল।

হুঁ অত্যন্ত সহজ কাজ। না পারার আছে কি! তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ছুটতে আরম্ভ করল। কদমতলার পাতার ঘর পার হয়ে সে উঠোনের মধ্যখানে এসে দাঁড়াল। তারপর পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে গেল।

আস্তে, একটু শব্দ না হয়, দরজার শিকল নামিয়ে সে ভিতরে ঢুকল। এক পাশে জড়ো করে রাখা বঁটি কাটারির গাদা সরিয়ে সে সেই ছোট জিনিসটা বেছে নিল। চমৎকার ধার, অথচ কত সহজে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নেওয়া যায়। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আবার সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। টিকটিকিটা শব্দ করছে না, এমন স্তব্ধ প্রগাঢ় নিশুতি।

আর অপেক্ষা করল না। কাঁধের পেশী ফুলিয়ে যেন নাচতে নাচতে, পায়ের এক ফোঁটা শব্দ না হয়, এমন অদ্ভুত একটা দৃশ্য নিয়ে বড়ঘরের সিঁড়ি ভেঙ্গে সে বারান্দায় উঠল। তারপর সোজা চলে গেল সেই ছোটঘরের দিকে, যেটা এবাড়ির বৈঠকখানা, যে ঘরে কর্তাবাবু শয্যা পেতেছে। তাই তো, তার গুরু তার মনিব তার শিক্ষাদাতা, বড় ভালবেসেছিল মানুষটাকে, বড় বেশি ভক্তি শ্রদ্ধা করত। কেমন করে কেবল একটা কোপ বসিয়ে গরম রক্ত ঝরাতে

হয় এই মানুষ তাকে শিখিয়েছিল, এই মানুষ।

কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে এসে তার গতি স্থির হয়ে গেল। যেন চিন্তা করতে পারছিল না, ভিতর থেকে খিল এঁটে মানুষটা ঘুমোবে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল হুলা, তারপর ঘুরে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের মোচড় দিয়ে লোহার গরাদ ভেঙ্গে কি তুমড়ে ফাঁক করে ভিতরে ঢুকতে পারবে সে। লোহা ভাঙ্গবার মতন বেঁকাবার মতন গায়ের জোর ঈশ্বর তাকে দিয়েছে।

না না, ঈশ্বর দেয়নি, এই মানুষ যুগিয়েছে, বল বিক্রম সাহস নিষ্ঠুরতা, সব তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। যেন এই জন্যই সহজ কাজটা শেষ করার আগে মনে মনে সে গুরুকে নমস্কার জানাল। তারপর জানালার পর্দাটা একটু ফাঁক করে গরাদে হাত রাখল, তারপর থমকে গেল।

তাই তো আলো জ্বলছে, একটা মোম গলে গলে শেষ হয়ে সলতেটা মুমূর্ষুর হাসি নিয়ে শেষবারের মতন ঝিকিয়ে উঠছে।

যেন পায়ের কাছে মাটিতে বসেছিল নতুন ঠাকরুণ। কর্তা হাত ধরে খাটের ওপর তাঁকে তুলে নিচ্ছে।

ক্ষমা করা, আমায় ক্ষমা কর।

বললাম তো ক্ষমা করেছি, চিরকালই আমি ক্ষমা করে এসেছি, তাই নয় কি!

কর্তাবাবু দুহাতে জড়িয়ে স্বরূপনগরের মাস্টারনীকে বুকে টেনে নিল।

আশা করি এবার তুমি নিশ্চিন্ত। যেন সোহাগ পেয়ে চোখে জল নিয়ে সুন্দর মানুষটা হাসল।

হু, তাই, এখানে শুধু তুমি আর আমি, কর্তাবাবুর গলার স্বর গুমগুম করে উঠল। দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই, তোমার গানের গুরুরা, বাজনার বন্ধুরা, কেউ এখানে নেই—

এই জন্যই ছুটে এসেছি, আর তুমি আমায় সন্দেহ করবে না, ঈর্ষা করবে না, তাই না ?

কিন্তু—হীরেন থমকে গেল।

কি হল ? রমলা বুক থেকে মুখ তুলল।

হুলা আছে না ? তাগড়া জোয়ান ছেলে, একটা পুরুষ—হীরেন বিড়বিড় করে উঠল।

ও তো চাকর। রমলা সান্ত্বনা দিল। হুলাকে দিয়ে আমি শুধু পা টেপাব, আর কিছু করব না, তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার গায় হাত রেখে বলছি—

হুলা আর দাঁড়াল না, যেন দেবতার ভাষা, স্বর্গের কথাবার্তা, কিছু বুঝল, অনেক কিছুই বুঝল না সে। টলতে টলতে জানালা থেকে সরে এসে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠোনে নামল। তার শীত করছিল।